পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ

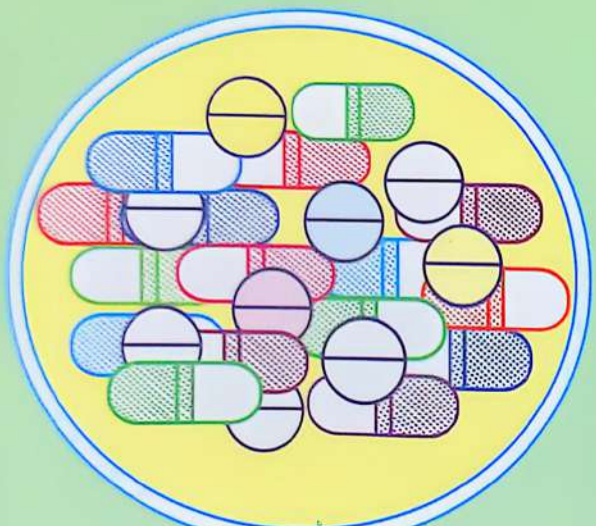

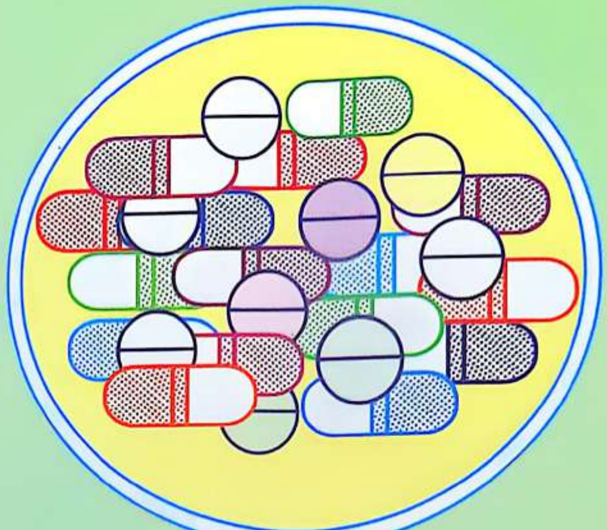

জাতীয় অধ্যাপক
ডাঃ নুরুল ইসলাম

পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম

ডি.এস.সি (অন.), এম.বি (কলি) টি.ডি.ডি. (ওয়েল্স), এফ.সি.সি.পি. (আমেরিকা),
এফ.সি.পি.এস. (পাক), এফ.আর.সি.পি. (লণ্ডন), এফ.আর.সি.পি. (এডিন),
এফ.সি.জি.পি. (বাংলাদেশ), এফ.এ.এস. (বাংলাদেশ)
স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার প্রাপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল শুভাকাঙ্খীদের

-যাদের সংখ্যা অসংখ্য

মুদ্রণের সার্বিক দায়িত্ব নিয়ে ছিল

- মোঃ মনজুরুল হক

উৎসর্গ

বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের
অগণিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের
চিকিৎসায় যারা নিয়োজিত
–তাঁদের উদ্দেশ্যে

পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ

১ম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ, ১৩৯৩
১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৬

২য় সংস্করণ ঃ
৩১শে ভাদ্র, ১৩৯৭
১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

৩য় সংস্করণ ঃ
১৭ই ফাল্গুন, ১৪০৩
১লা মার্চ, ১৯৯৭

৪র্থ সংস্করণ ঃ
১৭ই ভাদ্র, ১৪০৫
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮

৫ম সংস্করণ ঃ
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ২০০৮
৯ই জুন, ২০০১

৬ষ্ঠ সংস্করণ ঃ
১১ই মাঘ, ১৪১৭
২৪ জানুয়ারি, ২০১১

প্রকাশনায় ঃ ইসলামিক মেডিকেল মিশন

প্রচ্ছদ ঃ গ্রন্থকার

মুদ্রণ ঃ
মমিন অফসেট প্রেস
৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫
ফোন ঃ ৮৬১৬৪৭১

ISBN-984-31-0274-6

মূল্য ঃ দুইশত টাকা মাত্র।

Essential Drugs for Village Practice-A Publication dealing with essential drugs for village level health workers, immunization, diabetes, hypertension, rheumatic fever, nutrition, obesity, dangers from injection, animal bites and superstition about food for adults and children etc.

Price-Taka 200.00 Only. US $ 5

ষষ্ঠ সংস্করণ

লেখকের কথা

ইমামদের জন্য লেখা এ বইটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৫ এপ্রিল ১৯৮৬ সালে। বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীর নিকট বইট নানভাবে সমাদৃত হওয়ার ফলে এর চাহিদা বেড়েছে অনেক। অনেকের উপদেশ অনুসারে বেশ কয়েকটি নতুন বিষয় এতে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে নতুন সংস্করণে স্থান পেয়েছে *বিভিন্ন ধরণের খাদ্য তালিকা, ডায়াবেটিসের রোগ* চিকিৎসা, বিশেষ করে ***হার্টের বিভিন্ন ধরণের এনজিও চিকিৎসা,*** পেপটিক আলসারের ***এইচ পাইলোরির*** সর্ব-সাম্প্রতিক চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে *পূর্বের তিন সপ্তাহের স্থলে এক সপ্তাহ* প্রয়োজন হবে। চিকিৎসকদের নিকট এটি একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। আমার মতে এসব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নতুন বইতে সন্নিবেশিত করার ফলে বইটির কলেবর ও মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আশা করি পাঠক এবং বইটি যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তারা সকলেই উপকৃত হবেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে নতুন সংযোজনের ফলে বইটি বিপুলসংখ্যক দরিদ্র অসহায় জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে এ বিশ্বাস রাখি। যদি তাই হয়, মনে করব আমার প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সফল হয়েছে। আমি সকল পাঠক এবং চিকিৎসকদের মঙ্গল কামনা করি এবং তাদের সুস্বাস্থ্যের প্রত্যাশা রাখি। গঠনমুলক সমালোচনা বইটিকে আরও উচ্চমানের করে জনগণের কল্যাণ বয়ে আনবে এ প্রত্যাশা রইল।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম
ডি.এস.সি., এফ.আর.সি.পি, এডিন

২৪ জানুয়ারি ২০১১
গুলমেহের
৬৩ সেন্টাল রোড
ঢাকা-১২০৫

পঞ্চম সংস্করণ

লেখকের কথা

১৫ বৎসর আগে ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৬ সালে (১লা বৈশাখ, ১৩৯৩) "পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ" এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে মন্তব্য করেছিলাম ইমাম প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যদিও বইটা লেখা, গ্রাম পর্যায়ের প্রত্যেকটি চিকিৎসক এতে উপকৃত হবেন আশা করি। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমাম থেকে শুরু করে গ্রাম্য ডাক্তার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী এ বই থেকে উপকৃত হলে মনে করবো আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

অতি সল্প সময়ের মধ্যে ৫ম সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। বইটির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে দেখে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত। যাদের উদ্দেশ্যে এই বইটি লিখা তাদের সকলেই এতে উপকৃত হয়েছেন হয়ত, নইলে এর চাহিদা এমনভাবে বেড়ে যেত না। বর্তমান সংস্করণে কয়েকটি নতুন সংযোজন যেমন ডেঙ্গুঁ জ্বর, এইডস এবং আর্সেনিক এর ভয়াবহতাসহ কয়েকটি সময়োপযোগী এবং প্রচলিত সমস্যা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার একটি যথাযথ প্রয়াস। বইটি ব্যবসায়িক স্বার্থে নয় জনগণের স্বার্থেই প্রকাশিত। জনগণ উপকৃত হলে মনে করবো আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছে।

জুন, ২০০১ নুরুল ইসলাম

গুলমেহের
৬৩, সেন্ট্রাল রোড
ঢাকা-১২০৫

প্রথম সংস্করণ

লেখকের কথা

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগের বসবাস গ্রামাঞ্চলে। প্রতি ৫০ হাজার লোকের জন্য একজন পাশ করা ডাক্তার। ফলে এদের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়। আবার এসব চিকিৎসকের অনেকের নূন্যতম যোগ্যতাও নেই।

গ্রাম পর্যায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা এখন স্বীকৃত। পল্লী চিকিৎসক এবং গ্রাম ডাক্তার এখন আর অবহেলার পাত্র নয়। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গ্রাম পর্যায়ে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করেছে। এ সমস্ত ওষুধ সহজে পাওয়া যায়, মোটামুটি নিরাপদ এবং সাধারণ রোগের চিকিৎসার সহায়ক। 'পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ' বইটিতে এ ধরনের মোট ২৫ টি ওষুধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ওষুধের মাত্রা, ব্যবহার বিধি, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং একই ওষুধের বিভিন্ন বাজারজাত নাম এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসলামিক মেডিকেল মিশন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে 'পল্লী চিকিৎসায় ইমাম প্রশিক্ষণ' একটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে অনেকে অভিহিত করেছেন। আবার অনেকে আশা প্রকাশ করেছেন যে, এর ফল সুদূরপ্রসারী হবে। প্রতিটি গ্রামে একটা মসজিদ যদি নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং ইমামগণ যদি এতে অংশগ্রহণ করেন তা হলে কর্মের মাধ্যমে আমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো।

ইমাম প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যদিও বইটা লেখা, গ্রাম পর্যায়ের প্রত্যেকটি চিকিৎসক এতে উপকৃত হবেন আশা করি। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমাম থেকে শুরু করে গ্রাম ডাক্তার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী এ বই থেকে উপকৃত হলে মনে করবো আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

ইসলামিক মেডিকেল মিশন — *নুরুল ইসলাম*

ঢাকা-১২০৫।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

৯. এসপিরিন টেবলেট

১২. প্যারাসিটামল টেবলেট/সিরাপ/সাসপেনশন

১৪. আইবুপ্রোফেন টেবলেট

১৬. ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন টেবলেট/সিরাপ

১৯. বেনজাইল পেনিসিলিন ইনজেকশন

২১. এমপিসিলিন ক্যাপসুল/সিরাপ

২৪. ক্লক্সাসিলিন ক্যাপসুল/সিরাপ

২৬. মেক্সিসিলিন ক্যাপসুল/সিরাপ

২৮. সিপ্রোফ্লক্সাসিন টেবলেট

২৯. টেট্রাসাইক্লিন/অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল

৩১. ডক্সিসাইক্লিন ক্যাপসুল

৩২. কোট্রাইমোক্সাজল টেবলেট/সাসপেনশন

৩৪. মেট্রোনিডাজল টেবলেট/সিরাপ

৩৭. ক্লোরোকুইন ফসফেট টেবলেট/সিরাপ

৩৯. সালফাডক্সিন ও পাইরিমেথামিন টেবলেট

৪০. এমাইনোফাইলিন টেবলেট/ইনজেকশন

৪২. ইফেড্রিন টেবলেট/সিরাপ

৪৪. সালবিউটামল টেবলেট/সিরাপ

৪৬. ডেক্সট্রোমেথরফ্যান সিরাপ

৪৭. প্রোমেথাজিন টেবলেট/সিরাপ/ইনজেকশন

৪৯. ক্লোরফেনিরামিন টেবলেট/সিরাপ

৫১. মেডেনডাজল টেবলেট/সিরাপ

৫৪. এলবেনডাজল টেবলেট

৫৫. বেনজাইল বেনজয়েট মলম

৫৭. বেনজয়িক এসিড এবং সেলিসাইলিক এসিডের মিশ্রণ
৫৮. গ্রাইসোফুলভিন টেবলেট/সিরাপ
৬০. ফ্লুকোণাজল ক্যাপসুল
৬১. প্রোপ্রানোলল টেবলেট
৬২. আর্গোমেট্রিন/মিথাইল আর্গোমেট্রিন ম্যালেট টেবলেট
৬৪. ফেরাস সালফেট ফিউমারেট টেবলেট/সিরাপ
৬৭. ভিটামিন এ ক্যাপসুল
৬৯. ক্লোরামফেনিকল চোখের ও কানের ড্রপ/মলম
৭২. এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড টেবলেট/লিকুইড অথবা এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়াম ট্রাইসিলিকেট টেবলেট/লিকুইড
৭৪. রেনিটিডিন টেবলেট
৭৫. ওমিপ্রাজল টেবলেট
৭৬. হায়োসিন এন বিউটাইল ব্রোমাইড টেবলেট/ইনজেকশন
৭৮. ডায়াজিপাম টেবলেট/ইনজেকশন
৮১. ফ্রুসেমাইড টেবলেট/ইনজেকশন
৮৪. গ্লুকোজ ইলেকট্রোলাইট পাউডার (ও, আর, এস)
৮৫. ডায়রিয়া হলে করণীয়
৮৭. বিভিন্ন মানের আইভি স্যালাইন
৯০. অল্প বয়সে বিবাহ
৯১. টিকা
৯৩. হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন
৯৪. জলবসন্তের টিকা
৯৫. শিশুর শারীরিক বাড়তির হার
৯৬. ক্যান্সার সম্পর্কে কিছু কথা
৯৮. ইনজেকশনের বিপদ
৯৯. পুষ্টি সম্বন্ধে কিছু কথা
১০১. আয়োডিনের অভাব

১০৩.   কোলেস্টেরল
১০৫.   খাবারে কুসংস্কার
১১৭.   খাবার সম্বন্ধে আর কিছু কথা
১১৯.   কুষ্ঠ বা লেপ্রোসী
১২০.   কয়েকটি বদঅভ্যাস ও ভুল ধারণা
১২২.   হজমী ঔষধ
১২৩.   আপনার ওজন যদি বেশী হয়
১২৪.   শিশুর খাবার
১২৫.   ডায়বেটিস বা বহুমূত্র রোগ
১৩২.   রিউমেটিক ফিভার বা বাতজ্বর
১৩৫.   উচ্চ রক্তচাপ (ব্লাড প্রেসার)
১৩৭.   স্ট্রোক
১৩৯.   মৃগী
১৪০.   এইড্স্
১৪১.   আর্সেনিক বিষয়ে জরুরী বার্তা
১৪৪.   ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ
১৪৫.   ধনুষ্টংকার
১৪৬.   শিশুদের সর্দি কাশি ও জ্বর
১৪৭.   শিশুদের খিঁচুনির কারণ
১৪৯.   দু-একটি জরুরী অবস্থায় কি করণীয়
১৫০.   ইসলামে তামাক ও ধূমপান হারাম কেন
১৫৩.   ডেঙ্গুঁ জ্বর
১৫৯.   Drug Treatment of Uncomplicated Malaria in Adults
১৬১.   Box 4.13 Durg treatment of uncomplicated malarial in adults
১৬৩.   Malaria Prophylaxis for Adult Travellers
১৬৪.   Box 4.14 Malaria prophylaxis for adult travellers
১৬৫.   Recommended regimens for Helicobacter pylori eradication in adults one week

১৬৬. Pharmacological therapy in Acute Coronary Syndromes

১৬৭. *Plus for non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI)*

১৬৮. *Plus for ST-elevation myocardial infarction (STEMI)*

১৭১. বিভিন্ন ধরণের খাবার যারা ওজন কমাতে চান তাদের খাবার

১৭২. ক্যালরী-১২০০কি. ক্যালরী প্রোটিন-৫৪ গ্রাম ফ্যাট-২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট-১৭৫ গ্রাম

১৭৪. যারা ওজন বাড়াতে চান তাদের খাবার

১৭৬. ডায়াবেটিস রোগীর খাবার

১৭৯. হৃদরোগের খাবার তালিকা

১৮১. ব্ল্যাড পেসার বা উচ্চ রক্তচাপ
রোগীর খাবার তালিকা

১৮৫. ডায়াবেটিস থেকে কিডনি ফেইল্যুর

১৮৬. ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথির লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ

১৮৮. চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

১৮৯. বৃদ্ধ বয়সের খাবারের তালিকা

১৯১. দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ কি?

১৯১. কি এই কিডনীর ছাকনী?

১৯২. দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগের জটিলতা

১৯৪: কিডনী

১৯৫. কিডনী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

১৯৬. **হামদর্দের** বাজারজাত কিছু ইপকারী ওষুধ

২১৩. *Chairmen, Ex. Chairmen & Members of Board of Trustees, Hamdard (Banglades & Pakistan)*

২১৪. *Vice Chairmen, Members of Board of Trustees, Hamdard Banglades*

২১৬. বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস

এসপিরিন টেবলেট

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে ঃ
টেবলেট ১–৩ টা দিনে ৩–৪ বার
অর্থাৎ আট থেকে ছয় ঘন্টা পর পর।

শিশুদের ক্ষেত্রেঃ

১–৫ বৎসরঃ টেবলেট $\frac{১}{৪}$ – $\frac{১}{২}$ টা দিনে ৩-৪ বার।

৬–১২ বৎসর ঃ টেবলেট $\frac{১}{৪}$ – ১$\frac{১}{২}$ টা দিনে ৩–৪ বার।

কিভাবে পাওয়া যায়
টেবলেট – ৩০০ মিলিগ্রাম
টেবলেট ১০০ এবং ৭৫ মিলিগ্রামের প্রতিটি।*
(এই মাত্রা শুধু রক্তজমাট প্রতিরোধের জন্য হৃদরোগীদের ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া হয়)

ব্যবহারের বিবরণ

সাধারণতঃ ব্যথা কিংবা জ্বরের ওষুধ নামে পরিচিত। সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় সর্দিজ্বরে। নাক দিয়ে পানি পড়া, চোখজ্বালা, জ্বর, গায়ে ব্যথা, মাথাব্যথা, হাঁচি, কাশি ইত্যাদি সর্দিজ্বরের লক্ষণ। শুধুমাত্র ব্যথা ও জ্বরের উপশমই এসপিরিন ব্যবহারের উদ্দেশ্য। তাই এ লক্ষণ দুটির উপশম হলেই সর্দিজ্বরে এর আর কোন প্রয়োজন পড়ে না।

নানা কারণে জ্বর হতে পারে। ঘা, পাঁচড়া, কান অথবা টনসিলের প্রদাহ, হাম, কাশি, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদিতে জ্বর হতে পারে। যে কারণে জ্বর হয়েছে তার চিকিৎসা করাই নিয়ম, তবে জ্বরের মাত্রা অতিরিক্ত হলে শরীরের নানা ক্ষতি হতে পারে বলে সাময়িকভাবে হলেও তা কমানোর প্রয়োজন। শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যেই

এসপিরিন ব্যবহার করা যেতে পারে। মাথাব্যথা, দাঁতে ব্যথা, গায়ে-হাতে ও পায়ে ব্যথা, যে কোন প্রকার কাটা, পোড়া ও আঘাতজনিত ব্যথা ইত্যাদির সাময়িক উপশমে এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। অসহ্য ব্যথা কমানো এ সকল রোগে এসপিরিন প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যথা কমে গেলেই এর ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে।

কোন কোন মহিলার বিশেষ করে ১৫-২৫ বৎসর বয়সের মহিলাদের মাসিক বা স্রাবের সময় তলপেট ব্যথা হয়। এই ব্যথার উপশমের জন্য এসপিরিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

নানা প্রকার বাতের ব্যথায় এসপিরিন ব্যবহার করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে রিউমেটিক ফিভার বা বাতজ্বর। এ রোগ ৫-১৫ বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েদের হয়ে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গলাব্যথা হয়ে এ রোগের শুরু হয়। সপ্তাহ ২-৩ পরে হাতের এবং পায়ের বড় গিরাগুলো একের পর এক ফুলে যেতে পারে আর ব্যথা করে, গায়ে জ্বর থাকে।

এ ছাড়া রয়েছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সাধারণতঃ ১৫ বৎসর বয়সের নীচে এটা হয় না এবং বেশীর ভাগ রুগী ৩০ বৎসর এর উর্দ্ধে এবং তুলনামূলকভাবে মেয়েদের বেশী হয়। এতে বিশেষ করে হাতের আঙ্গুলের গিরাগুলো ফুলে যায়। পরে কব্জি, কনুই আক্রান্ত হয়। তেমনি পায়ের গোড়ালি থেকে শুরু করে হাঁটু এবং অন্যান্য গিরা ফুলে যায় ও ব্যথা করে, বিশেষ করে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠার পর। জ্বরের মাত্রা বাতজ্বরের তুলনায় কম, এমনকি নাও থাকতে পারে। দীর্ঘদিন ভুগলে গিরার নড়াচড়া সীমিত হয়ে যায়, বাঁকানো সম্ভব হয় না, বিকলাঙ্গতা দেখা দেয়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে আরেক ধরনের বাতের ব্যথা হয় যার নাম অস্টিওআর্থ্রোসিস। এ ব্যথায় জ্বর হয় না। এ রোগে হাঁটু সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে রুগী নড়াচড়া কিংবা চলাফেরা করলে গিরার ভিতর এক ধরনের কচ্ কচ্ করে শব্দ হয় বলে রুগী বলতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার বাতের চিকিৎসায় এসপিরিন দীর্ঘদিন ব্যবহার করা হয়। ওষুধের মাত্রা ঠিক ততটুকু হওয়া উচিত যা ব্যথা ও অন্যান্য লক্ষণ উপশমে প্রয়োজন।

বিপদ ও সতর্কতা

- মনে রাখতে হবে যে জ্বর ব্যথা হওয়া মাত্রই এসপিরিন প্রয়োগ রোগের লক্ষণকে দমিয়ে দিয়ে রোগ নির্ণয়ে যেন অযথা বিলম্ব না ঘটায়।
- পেপটিক আলসার বা পাকস্থলীর ক্ষত (ঘা) থাকলে বা এ রোগের লক্ষণ থাকলে এটা ব্যবহার না করা উচিত, পেটের কোন ব্যথায় এটা দেওয়া উচিত নয়।
- রক্ত বমি বা আলকাতরার মত কাল নরম পায়খানা হলে এটা খাওয়া যাবে না।
- যে সমস্ত রুগীর কোথাও একটু কেটে গেলে সহজে রক্ত বন্ধ হতে চায় না এবং নাক ও দাঁত দিয়ে রক্ত যায়, কারণ নির্ধারণের আগে সাময়িকভাবে হলেও তাদের এসপিরিন দেওয়া উচিত নয়। এতে রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি পেতে পারে।
- হাঁপানি রুগীদের এসপিরিন না খাওয়া ভাল এতে হাঁপানি বাড়তে পারে।
- এসপিরিন খালি পেটে খেলে পাকস্থলীতে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে বলে সব সময় ভরাপেটে এ ওষুধ খাওয়া উচিত।
- কোন কোন রোগ নিরাময়ে সহায়ক হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এসপিরিন সাময়িক উপশমের জন্য ব্যবহৃত হয়। রোগ নির্ণয় এবং তার সঠিক চিকিৎসা অপরিহার্য। এর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ সময়মত নিতে হবে।

কয়েকটি বাজারজাত এসপিরিনের নাম

ইকোসপ্রিন টেবলেট	(একমি)
ইকোসপ্রিন ৭৫	(একমি)
এনকোপাইরিন	(জেসন)
সলরিন	(অপসোনিন)
ডিসপিরিন	(রেকেট এন্ড কোলম্যান)
ডিসপিরিন সিভি ১০০	(রেকেট এন্ড কোলম্যান)

প্যারাসিটামল টেবলেট/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

১–২ টা টেবলেট দিনে ৩–৪ বার

অর্থাৎ আট থেকে ছয় ঘন্টা পর পর।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

১ বৎসরের নীচে ঃ সিরাপ $\frac{১}{২}$ চা চামচ দিনে ৩–৪ বার।

১–৫ বৎসর সিরাপ ঃ ১–২ চা–চামচ দিনে ৩–৪বার।

৬–১২ বৎসর ঃ টেবলেট $\frac{১}{২}$ –১টা দিনে ৩–৪ বার।

অথবা সিরাপ ২–৪ চামচ দিনে ৩–৪ বার।

কিভাবে পাওয়া যায়–

টেবলেট – ৫০০ মিলিগ্রাম প্রতিটি।

সিরাপ–১২০ মিলিগ্রাম প্রতিচামচ (চা-চামচ)

সাসপেনশন-ঐ

ব্যবহারের নিয়ম

এর ব্যবহার অনেকাংশে এসপিরিনের ব্যবহারের মত। জ্বর ও ব্যথার উপশমের উদ্দেশ্যেই এটা ব্যবহার করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে এসপিরিনের ব্যবহার করা হয় সেখানে প্যারাসিটামল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেহেতু এ ওষুধের কার্যকারিতা এসপিরিনের চেয়ে কম, যেখানে এসপিরিন ব্যবহার করা যায় না সেখানে প্যারাসিটামল ব্যবহার করা যেতে পারে। যাদের পেপটিক আলসার বা পাকস্থলীতে ক্ষতের লক্ষণ রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এসপিরিনের পরিবর্তে প্যারাসিটামল প্রয়োগ করা উচিত। তবে বেশীরভাগ বাতের চিকিৎসায় প্যারাসিটামল এসপিরিনের তুলনায় কম কার্যকরী।

মোটকথা যেখানে এসপিরিন ব্যবহার করা উচিত, অথচ এর ব্যবহারে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে সেখানে প্যারাসিটামল ব্যবহার করা উচিত। এর সেবনও খাবারের পর করতে হবে।

বিপদ ও সতর্কতা

- দীর্ঘদিন অধিক মাত্রায় প্যারাসিটামল গ্রহণ যকৃত ও কিডনীর জন্য ক্ষতিকারক।
- পাণ্ডুরোগে ব্যবহার না করা উত্তম।
- যকৃতের রোগগ্রস্থ রুগীর বেলায় অধিক মাত্রায় প্যারাসিটামল ক্ষতিকারক।

কয়েকটি বাজারজাত প্যারাসিটামলের নাম

ফেনডল	(জনসেবা)	জেরিন	(জেসন)
নাপা	(বেক্সিমকো)	এ্যাভলোপল	(এ সি আই)
ফাইটামল	(ফাইসন্স)	সারভিজেসিক	(নোভারটিস)
এনালপাইরিন	(একমি)	এনালপেইন	(ফার্মাদেশ)
সিনাপল	(ইবনে সিনা)	সিপলাডল	(সিপলা)
জেনামল	(জেনারেল)	ফিভেক	(ওরিয়ন)
আপা	(অপসোনিন)		

ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, পীড়িতকে দেখাশুনা কর, অন্যায়ভাবে অবরুদ্ধ বন্দীকে মুক্ত কর। যে কোন অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য করিবে — সে মুসলমান হোক বা অমুসলমান।

যখন পীড়িতকে দেখিতে যাও, তাহার দুঃখে সান্ত্বনা দিবে ও বলিবে, 'তুমি শীঘ্র সুস্থ হইবে ও দীর্ঘজীবী হইবে।' কারণ, এই কথায় যাহা পূর্ব নির্ধারিত তাহা রোধ হইবেনা বটে; কিন্তু উহা তাহার আত্মার জন্য সান্ত্বনাদায়ক হইবে — রাসূলুল্লাহর বাণী

আইবুপ্রোফেন টেবলেট

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে ঃ
টেবলেট ১–৩ টা দিনে ১–৩ বার।

শিশুদের ক্ষেত্রে ঃ
এ ওষুধ দেয়া হয় না।

কিভাবে পাওয়া যায়ঃ
টেবলেট– ২০০ বা ৪০০ মিলিগ্রাম প্রতিটি।

ব্যবহারের বিবরণ

ইহা একটি প্রদাহ এবং ব্যথা নিবারণকারী ওষুধ। সাধরণতঃ এ ওষুধ মাংসপেশীতে ব্যথা, কাঁধে ব্যথা, কোমর ব্যথাতে খুবই কার্যকরী। হাতের কব্জি, পায়ের গিরা এবং আঙ্গুলের গিটেতে বাতজনিত ব্যথায় এ ওষুধ ফলপ্রদ।

এ ওষুধ কখনও খালি পেটে খাওয়া যাবে না। সবসময় খাওয়ার পর এ ওষুধ সেবন করা উচিত।

যাদের পেপটিক আলসার আছে তাদের ক্ষেত্রে এ ওষুধ ব্যবহার না করাই ভাল।

নানা প্রকার বাতের ব্যথায় এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। যেমন–রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। এতে পায়ের গিরা, হাতের কব্জি, কনুই আক্রান্ত হয়। বয়স্কদের ক্ষেত্রে আরেক ধরণের বাতের ব্যথায় যেমন-অসটিওআর্থ্রোসিস, এতে হাঁটুতে ব্যথা হয়। রুগী হাঁটতে পারে না।

বিপদ ও সতর্কতা

- এ ওষুধ ব্যবহারের ফলে পেটে ব্যথা, পেট ফাঁপা এবং পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে।

- যদি কখনও ভুলক্রমে এ ওষুধ বেশী মাত্রায় সেবন করা হয় তাহলে সাথে সাথে ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া অতি বাঞ্ছনীয়।
- পেটের কোন ব্যথায় এ ওষুধ দেয়া উচিত নয়।
- রক্তবমি বা আলকাতরার মত কাল নরম পায়খানা হলে এটা খাওয়া যাবে না।
- যে সমস্ত রুগীর কোথাও একটু কেটে গেলে সহজে রক্ত বন্ধ হতে চায় না এবং নাক ও দাঁত দিয়ে রক্ত যায়, সেসব ক্ষেত্রে এ ওষুধ দেয়া যাবে না। কারণ এতে রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ

নোফ্লাম	(গ্লাক্সো-ওয়েলকাম)
ইনফ্লাম	(ফাইসন্স)
রিউমাফেন	(বেক্সিমকো)
সারভিপ্রোফেন	(নোভারটিস)
নরফেন	(এস কে এফ)
ফ্লামেক্স	(এসিআই)
অপসোফেন	(অপসোনিন)
বুফেন এস আর	(ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল)

গাঁটে বহুদিনের ফুলা/ব্যথা থাকলে ওষুধ ব্যবহার যদি অপরিহার্য হয় এক ধরণের ব্যথার ওষুধ পায়খানার রাস্তা দিয়ে দেওয়া যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। প্রয়োজনে আরও ব্যবস্থা আছে।

ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন টেবলেট/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে –

টেবলেট ১–২ টা ৬ ঘন্টা পর পর (দিনে ৪ বার) ৫–১০ দিন।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

১ বৎসরের নীচে ঃ সিরাপ $\frac{১}{২}$ চামচ ৬ ঘন্টা পর পর।

১–৫ বৎসর ঃ সিরাপ $\frac{১}{২}$ –১ চামচ ৬ ঘন্টা পর পর।

৬–১২ বৎসর ঃ টেবলেট – $\frac{১}{২}$ – ১টা করে (২৫০ মিলিগ্রামের) ৬ ঘন্টা পর পর বা ১–২টা করে (১২৫ মিলিগ্রামের) ৬ ঘন্টা পর পর।

কিভাবে পাওয়া যায়–

টেবলেট ১২৫ বা ২৫০ মিলিগ্রামের প্রতিটি।

সিরাপ ১২৫ মিলিগ্রাম প্রতি চা চামচ।

- পাউডার আকারে শিশিতে যেগুলি পাওয়া যায় তার সাথে শিশির গায়ে লেখা নির্দেশমত পানি (প্রথমে ফুটিয়ে পরে ঠান্ডা করে) মিশিয়ে সিরাপ বানিয়ে নিতে হয়।

সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এন্টিবায়টিকের মধ্যে এটি প্রধান। এ ওষুধ অনেক ধরনের সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে।

শরীরের কোন জায়গায় কেটে গেলে, কাঁটা ফুটলে, পুড়ে গেলে, জন্তু-জানোয়ার কামড় দিলে সে জায়গা পরিষ্কার করে ডেটল বা সেভলন লাগিয়ে বিশুদ্ধ গজ বা তুলা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। কিন্তু এরপরও ক্ষতস্থানে সংক্রমণ হতে পারে। জ্বর, ক্ষতস্থানে ব্যথা বৃদ্ধি এবং ক্ষতস্থানে পুঁজ হওয়া সংক্রমণের লক্ষণ। এসব ক্ষেত্রে ওষুধ দেয়া প্রয়োজন।

ক্ষতের পরিমাণ বেশী হলে বা ক্ষতস্থানে ধূলাবালি, কাদামাটি, গোবর বা অনুরূপ যে কোন বস্তুর সংযোগ ঘটে থাকলে শুরুতেই এ ওষুধ দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে সংক্রমণ অবশ্যম্ভাবী, এমনকি ধনুষ্টংকারও হতে পারে।

শরীরের যে কোন জায়গায় ঘা-পাঁচড়া হলে এ ওষুধ দেয়া যেতে পারে।

● কিছুসংখ্যক ক্ষেত্রে অবশ্য এ ওষুধে ঘা শুকায়না। সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সর্দি-কাশির প্রকোপ এদেশে অত্যন্ত বেশী। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এটা ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে, যেখানে এন্টিবায়োটিকের কোন ভূমিকা নেই। হাম, জলবসন্ত ইত্যাদি ভাইরাসজনিত রোগে এন্টিবায়োটিক কোন কাজে লাগে না। শরীরের প্রতিরোধ শক্তির মাধ্যমে সময়মত এগুলো সেরে যায়। কারও কারও বেলায় এ সমস্ত রোগে অন্য জীবাণুর আক্রমণের উপসর্গ দেখা দিলে এন্টিবায়োটিকের দরকার হয়। যেমন এ সমস্ত রোগীর জটিলতা হিসেবে নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। এমপিসিলিনও ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংক্রমণের কারণ যেখানে ব্যাকটেরিয়া, তার বেশীরভাগের বিরুদ্ধেই এ ওষুধ কার্যকরী। টনসিলের প্রদাহ, কানে ব্যথা, এক সপ্তাহের উপর সর্দি, কফযুক্ত কাশি, সেই সঙ্গে জ্বর, ইত্যাদিতেও এ ওষুধ কার্যকরী।

রিউমেটিক ফিভার বা বাতজ্বরে এ ওষুধ কার্যকরী। তবে মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে এ রোগে প্রতিরোধক হিসেবে এ ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহার অনেকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই প্রাথমিকভাবে এ ওষুধে রোগটির চিকিৎসা ছাড়াও উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

● ডায়রিয়া, কিডনী (বৃক্ক), মূত্রনালী ও মূত্রাশয়ের সংক্রমণে এ ওষুধ কোন কাজ করে না।

● আর কতগুলো রোগে এ ওষুধ কার্যকরী হলেও সেগুলোতে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা সঠিক এন্টিবায়োটিকের সাহায্য নেয়া উচিত।

● যদি ওষুধ খাওয়ার ২–৪ দিনের মধ্যে কোন প্রকার উন্নতি না হয় বা সংক্রমণ গুরুতর রূপ নেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

বিপদ ও সতর্কতা

● ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন সবার জন্যই একটি নিরাপদ ওষুধ এবং এর মাত্রা প্রয়োজনাতিরিক্ত হলে ক্ষতি নেই তবে প্রয়োজনের চেয়ে কম বা অনিয়মিত সেবন করলে সংক্রমণ দমন হয় না বরং আক্রমণকারী জীবাণুগুলো এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে এবং রোগ নিরাময় কঠিনতর করে তোলে।

● রোগের লক্ষণগুলো ভাল হয়ে গেলেও এ ওষুধ ৫–১০ দিন, কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশীদিন চালিয়ে যাওয়া উচিত।

● কোন কোন ক্ষেত্রে এ ওষুধ এলার্জি জাতীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যার ফলে শরীরের জায়গায় জায়গায় লাল লাল চাকা উঠতে পারে ও চুলকায়। সাধারণভাবে এ ওষুধ খাওয়ার কয়েক ঘন্টা বা একদিন পর এ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তা কয়েকদিন পর্যন্ত থাকে। খুব কম ক্ষেত্রে এটা মারাত্মক ধরনের এলার্জিক প্রতিক্রিয়া বা এলার্জিজনিত শক্ সৃষ্টি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে মুখ-হাত পা ফোলা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অবিলম্বে এ ওষুধ বন্ধ করে উপযুক্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

● কাটা, ঘা বা পোড়া স্থানে এর প্রলেপ দেয়া মোটেও উপকারী নয়, বরং অপকারী।

কয়েকটি বাজারজাত পেনিসিলিন টেবলেট/সিরাপ এর নাম

ওরাসিন–কে	(রোন পোলেনৃক)	ফার্মাপেন	(ফার্মাদেশ)
ক্রিস্টাপেন- ভি	(গ্লাক্সো-ওয়েলকাম)		

বেনজাইল পেনিসিলিন ইনজেকশন

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

৫–১০ লক্ষ ইউনিট মাংসে বা শিরায় ৬–৮ ঘন্টা পর পর ৫–১০দিন।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

৪ বৎসরের নীচে ঃ

পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার চারভাগের একভাগ, একইভাবে।

৬–১২ বৎসর ঃ

পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার অর্ধেক, একইভাবে।

গুরুতর সংক্রমণে উপরোক্ত মাত্রা দ্বিগুণ করা যেতে পারে। বেশী মাত্রা ব্যবহার করতে হলে এ ইনজেকশন শিরায় দেওয়া উচিত।

কিভাবে পাওয়া যায় ঃ

প্রতি এম্পুল ৫ লক্ষ ইউনিটের (এককের) অথবা ১০ লক্ষ ইউনিটের।

ব্যবহারের বিবরণ

এটি অনেক ধরনের সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরী জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধ। ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন ও বেনজাইল পেনিসিলিন হচ্ছে একই ওষুধের দুই রূপ। প্রথমটি মুখে খেতে হয়; আর বেনজাইল পেনিসিলিন ইনজেকশন আকারে মাংসে অথবা শিরায় দিতে হয়।

যেসব সংক্রমণে ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন কার্যকরী সেসব ক্ষেত্রে এ ওষুধ কার্যকরী। সংক্রমণের মাত্রা গুরুতর না হলে ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন ব্যবহার করা উচিত।

যেসব রোগে এটা ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে রয়েছে নিউমোনিয়া, মেনিন্জাইটিস, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, বড় ধরনের কাটা বা পোড়া, চামড়ার দ্রুতহারে বেড়ে যাওয়া প্রদাহ, হৃদপিণ্ডের সংক্রমণ ইত্যাদি। তবে মেনিন্জাইটিস, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হৃদপিণ্ডজনিত সংক্রমণ প্রভৃতি রোগ শুধু এ ওষুধে ভাল হয় না। জটিল বলে এ সমস্ত রুগীকে যথাশীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো উচিত।

বিপদ ও সতর্কতা

কোন কোন ক্ষেত্রে এ ওষুধ মারাত্মক ধরনের এলার্জি বা এলার্জিজনিত শক্ সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে রুগীর শ্বাসকস্ট, মুখ-হাত পা ফুলে। এমনকি রুগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

যাদের একবার এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাদের আর কোন দিন এ ওষুধ দেওয়া উচিত নয়। এর অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত ব্যবহার ক্ষতিকর।

বাজারজাত এ ওষুধের নাম

পেন-জি (অপসোনিন)

বি-পেন (বেনজাথিন ১২ লাখ" পেনিসিলিন) (অপসোনিন)

ডায়ামিন পেনিসিলিন ১২ লাখ" (রেনাটা)

বিঃ দ্রঃ রিউমাটিক ফিভারে প্রতিষেধক হিসাবে বেনজাথিন পেনিসিলিন (১২ লাখ) প্রতি ৩ সপ্তাহ পর নিতে হবে।

সিফিলিস ঃ- বেনজাথিন পেনিসিলিন ২.৪ গ্রাম ১ সপ্তাহ পর পর ৩ টা।

সময়মত নখ কাটুন। এতে ময়লা জমে।

ময়লাতে জীবাণু থাকে – এতে অনেক রোগ ছড়ায়।

এমপিসিলিন ক্যাপসুল / সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা ঃ

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–
ক্যাপসুল ১টা করে ৬ ঘন্টা পর পর (দিনে ৪ বার) ৫–১০ দিন খাবারের আগে।

শিশুদের ক্ষেত্রে–
১–৫ বৎসর ঃ
সিরাপ ১/২ চামচ ৬ ঘন্টা পর পর। খাবারের আগে।

৬–১২ বৎসর ঃ
ক্যাপসুল ১টা করে ৬ ঘন্টা পর পর। খাবারের আগে।
সিরাপ ১–২ চা চামচ ৬ ঘন্টা পর পর। খাবারের আগে।

৬–১২ বৎসর ঃ

- গুরুতর সংক্রমণের ক্ষেত্রে বা টাইফয়েডের ক্ষেত্রে উপরোক্ত মাত্রাসমূহ দ্বিগুণ করা উচিত।

কিভাবে পাওয়া যায়–
ক্যাপসুল ২৫০ মিলিগ্রামের প্রতিটি
সিরাপ ১২৫ মিলিগ্রাম প্রতি চা-চামচ

পাউডার আকারের শিশিতে যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর সাথে পানি (প্রথমে ফুটিয়ে পরে ঠান্ডা করে) মিশিয়ে নির্দেশমত পরিমাণ সিরাপ বানিয়ে নিতে হবে।

ব্যবহারের বিবরণ

এটি একটি নিরাপদ কার্যকরী জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধ। যে সংক্রমণে ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন কার্যকর সেখানে এটি ব্যবহার না করাই উচিত। যে সংক্রমণে

ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন কোন কাজ করে না, সেক্ষেত্রে এমপিসিলিন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

● টনসিলে ব্যথা বা প্রদাহ, এক সপ্তাহের উপর সর্দি, পাকা কফযুক্ত কাশি, নিউমোনিয়া, চামড়ার বিভিন্ন ঘা, পাঁচড়া, মূত্রাশয়, মূত্রনালী ও কিডনী (বৃক্ক) সংক্রমণ, টাইফয়েড, রক্তআমাশয়, জরায়ুর সংক্রমণ প্রভৃতি রোগে এটি কার্যকরী।

● নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ হচ্ছে একটানা অত্যধিক জ্বর, কাশি, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস এবং বুকে ব্যথা হতে পারে। সাধারণতঃ কাশি বের হয় না, বের হলেও অতি অল্প।

● মূত্রনালী, মূত্রাশয় ও বৃক্কের (কিডনীর) সংক্রমণের লক্ষণগুলো হচ্ছে জ্বর, প্রসাবে জ্বালাপোড়া, ঘন ঘন বেগ হয় কিন্তু সাধারণতঃ পরিমাণ কম হয়, তলপেট কিংবা কোমরে ব্যথা এবং পস্রাবের রং লালচে, এমনকি লাল হওয়া।

● টাইফয়েড রোগের লক্ষণ হল জ্বর, যা প্রথমে অল্প, পরে ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ২–৩ দিনে অত্যধিক মাত্রায় গিয়ে পৌছে, এবং তারপর একটানা চলতে থাকে। মাথা ব্যথা, গায়ে ও হাতে পায়ে ব্যথা ছাড়াও প্রথমে ছয়-সাত দিন কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পরবর্তীতে পাতলা পায়খানা হতে পারে। রুগী ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায় এমনকি প্রলাপ বকতে পারে। নাড়ীর স্পন্দন জ্বরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত থাকে। যেমন ১০২°–১০৩° ডিগ্রী জ্বর হলেও নাড়ীর গতি একশতের কাছাকাছি থাকতে পারে।

● রক্ত আমাশয় হলে রুগীর ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়। দিনে ১৫-২০ বার বা তার চেয়ে বেশী হতে পারে। পায়খানায় রক্ত কিংবা রক্ত মেশানো হতে পারে। সাধারণতঃ আম অথবা মলের চেয়ে রক্তের পরিমাণ বেশী। রুগীর তলপেটে ব্যথা হয়। পায়খানার রাস্তায় শূল দেয়। বার বার পায়খানার বেগ হয়। অথচ পায়খানায় গেলে মনে হয় যতটুকু হওয়া উচিত তা হয়নি। সাধারণতঃ এ ধরনের আমাশয়ে জ্বর থাকে।

● কাঁচা বাচ্চা নষ্ট বা প্রসব পরবর্তী সময়ে জ্বর, তলপেটে ব্যথা এবং সেইসঙ্গে অস্বাভাবিক স্রাব(সঙ্গে রক্তক্ষরণ হতে পারে) জরায়ুর সংক্রমণের লক্ষণ।

বিপদ ও সতর্কতা

● প্রয়োজনের তুলনায় কম, অনিয়মিত এবং সঠিক মেয়াদের (৫−১০ দিন) কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন টাইফয়েড) আরও বেশী কম ব্যবহারে এ ওষুধে সংক্রমণ দমন হয় না এবং আক্রমণকারী জীবাণু এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে।

● এ ওষুধ প্রয়োগের ৩−৪ দিনের মধ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা না গেলে বা রুগীর অবস্থার অবনতি হলে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

কয়েকটি বাজারজাত এমপিসিলিনের নাম

ফাইসিলিন	(ফাইসন্স)	এ্যাভলোসিলিন	(এ.সি.আই)
পেন এ	(রেনেটা)	এমপিরেক্স	(জেসন)
এমপেক্সিন	(অপসোনিন)	একমিসিলিন	(এক্‌মি)
এমপিসিনা	(ইবনে সিনা)		

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার পরিজনবর্গ কখনও পর পর দুইদিন পেট ভরিয়া যবের রুটি খান নাই − (আয়েশা)

ক্লক্সাসিলিন ক্যাপসুল/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

ক্যাপসুল ১টা ৬ ঘন্টা পর পর দিনে ৪ বার ৭–১০ দিন

শিশুদের ক্ষেত্রে–

২ বৎসরের নীচে ঃ

সিরাপ $\frac{১}{২}$ চা-চামচ ৬ ঘন্টা পর পর

২–১২ বৎসর ঃ

সিরাপ ১ চা চামচ ৬ ঘন্টা পর পর (দিনে ৪ বার)

গুরুতর সংক্রমণের ক্ষেত্রে উক্ত মাত্রাসমূহ দ্বিগুণ করা যেতে পারে।

কিভাবে পাওয়া যায় ঃ

ক্যাপসুল ৫০০ মিলিগ্রামের প্রতিটি

সিরাপ ১২৫ মিলিগ্রাম প্রতি চা চামচ

● পাউডার আকারে শিশিতে যেগুলি পাওয়া যায় তার সাথে শিশির গায়ে লাগানো নির্দেশমত পানি (প্রথমে ফুটিয়ে পরে ঠান্ডা করে) মিশিয়ে সিরাপ বানিয়ে নিতে হয়।

ব্যবহারের বিবরণ

● এ ওষুধ প্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিকের মধ্যে একটি। বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণে এ ওষুধের ব্যবহার হয়। শরীরের কোন ঘা, পোড়া ঘা, পুঁজজনিত ঘা, ফোঁড়া ইত্যাদি রোগে এ ওষুধ বেশ কার্যকরী।

● চোখের এলেনা [Stye], কান পাকা, সংক্রমিত একজিমা, ব্রণ ইত্যাদিতে খুবই ফলপ্রদ।

ফুসফুসে প্রদাহ, নিউমোনিয়া, হাঁড়ের সংক্রমণে [Osteomyelitis] এ ওষুধ কার্যকরী।

● যদি খাওয়ার ২-৪ দিনের মধ্যে কোন প্রকার উন্নতি না হয় বা সংক্রমণ গুরুতর রূপ নেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

● আরও কতগুলো রোগে এ ওষুধ কার্যকরী হলেও সেক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা সঠিক এন্টিবায়োটিকের সাহায্য নেয়া উচিত।

বিপদ ও সতর্কতা

● প্রয়োজনের চেয়ে কম অনিয়মিত সেবন করলে সংক্রমণ দমন হয় না বরং আক্রমণকারী জীবাণুগুলো এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে এবং রোগ নিরাময় কঠিনতর করে তোলে।

● মাঝে মাঝে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হতে পারে।

● কোন কোন ক্ষেত্রে এ ওষুধ এলার্জি জাতীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ

ফাইক্লক্স	(ফাইসন্স)	ক্লক্সিক্যাপ	(রেনেটা)
ক্লোবেক্স	(বেক্সিমকো)	লাইসিক্লক্স	(গ্লাস্কো-ওয়েলকাম)
ক্লক্সিন	(অপসোনিন)	এক্লক্স	(একমি)
সিনাক্লক্স	(ইবনে সিনা)	এভলোক্লস্ক	(এ.সি.আই)

জীবনের একটা দিন চলে যাওয়া মানে আয়ু হ্রাস পাওয়া কাজেই প্রতিটি দিনকে অর্থবহ করে তোলা উচিৎ।

এমক্সিসিলিন ক্যাপসুল/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

ক্যাপসুল ১টা করে ৮ ঘন্টা পর পর (দিনে ৩ বার) ৫–১০দিন। গুরুতর সংক্রমণের ক্ষেত্রে যেমন, টাইফয়েড জ্বরে মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে এবং ১০-১৫ দিন চালাতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

২ বৎসরের নীচে ঃ

সিরাপ ১/২ চা-চামচ ৮ ঘন্টা পর পর (দিনে ৩ বার)

২–১২ বৎসর ঃ

সিরাপ ১চা চামচ ৮ ঘন্টা পর পর (দিনে ৩ বার)

গুরুতর সংক্রমণের ক্ষেত্রে মাত্রাসমূহ দ্বিগুণ করা যেতে পারে।

কিভাবে পাওয়া যায়–

ক্যাপসুল ২৫০ মিলিগ্রামের প্রতিটি

সিরাপ ১২৫ মিলিগ্রাম প্রতি চা-চামচ

● পাউডার আকারে শিশিতে যে গুলো পাওয়া যায় সেগুলোর সাথে পানি (প্রথমে ফুটিয়ে পরে ঠান্ডা করে) মিশিয়ে নির্দেশিত পরিমাণ মত সিরাপ বানিয়ে নিতে হয়।

ব্যবহারের বিবরণ

এটা একটি জীবাণু ধ্বংসকারী কার্যকরী ওষুধ। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন এবং এমপিসিলিন কাজ করে সেক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

যদি এমপিসিলিন কাজ না করে অথবা এমপিসিলিন ডায়রিয়া সৃষ্টি করে সেক্ষেত্রে এ ওষুধ কার্যকরী।

টনসিলে ব্যথা বা প্রদাহ, দীর্ঘদিন ধরে সর্দি, পাকা কফযুক্ত কাশি, নিউমোনিয়া, চামড়ার বিভিন্ন ঘা, পাঁচড়া, মূত্রনালী এবং বৃক্কে বিভিন্ন সংক্রমণে এ ওষুধ কার্যকরী। জরায়ুর সংক্রমণেও এ ওষুধ ফলপ্রদ।

নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ হচ্ছে একটানা অত্যধিক জ্বর, কাশি, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস এবং বুকে ব্যথাও হতে পারে। সাধারণতঃ কাশি বের হয় না, বের হলেও অতি অল্প। কাশ দিলে এবং শ্বাস নিলে বুকের ব্যথা বাড়ে।

বিপদ ও সতর্কতা

- প্রয়োজনের তুলনায় কম, অনিয়মিত এবং সঠিক মেয়াদের কম ব্যবহারে এ ওষুধে সংক্রমণ দমন হয় না এবং আক্রমণকারী জীবাণু এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে।
- এ ওষুধ প্রয়োগের ৩–৪ দিনের মধ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা না গেলে বা রুগীর অবস্থার অবনতি হলে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ

প্যান্টামক্স	(গ্ল্যাক্সো-ওয়েলকাম)	নিউসিল	(জনসেবা)
ফাইমক্সিল	(ফাইসন্স)	মক্সিন	(অপসোনিন)
মক্সিলিন	(একমি)	টাইসিল	(বেক্সিমকো)
সিনামক্স	(ইবনে সিনা)	ডেমক্সিল	(ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল)
এমোক্সিক্যাপ	(রেনেটা)	এসকেমক্স	(এসকেএফ)
জেনামক্স	(জেনারেল)	এ্যাভলোমক্স	(এ.সি.আই)
ফার্মোক্সিল	(ফার্মাদেশ)	সার্ভিমক্স	(নোভারটিস)
ওরিক্সিল	(ওরিয়ন)		

ধূমপানে বিষপান

সিপ্রোফ্লক্সাসিন

ব্যবহারের মাত্রা

শ্বাসতন্ত্র সংক্রমণ ঃ ২৫০-৭৫০মিঃ গ্রাঃ ১২ ঘন্টা পর পর ৭-১০দিন

মূত্রনালী সংক্রমণ ঃ ২৫০-৫০০ মিঃ গ্রাঃ ১২ ঘন্টা পর পর ৭-১০ দিন

গনোরিয়া ঃ ২৫০ মিঃ গ্রাঃ একবার

তবে ৫০০ মিঃ গ্রাঃ একবার দেওয়া উত্তম। শিশুদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ব্যবহারের বিবরণ

জীবাণু ধ্বংসকারী কার্যকরী ঔষধ,
শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ,
প্রস্রাবের ও পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ,
বিশেষ করে টাইফয়েড-
(কোট্রাইমোক্সাজল কিম্বা এমোক্সিসিলিন ব্যবহার আগে হয়ে থাকলে),ত্বকের সংক্রমণ,
গনোরিয়া (ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহার করা যেতে পারে)
নাক, কান, গলা ও চোখের সংক্রমণ ইত্যাদি।

- **বিপদ ও সতর্কতা ঃ** গর্ভাবস্থায় দেয়া যাবে না।

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ

সিপ্রো-এ	(একমি)	ফ্লাক্সাবিড	(এ সি আই)
ব্যাকটিন	(ইবনে সিনা)	জেফ্লোক্স	(জেনারেল)
কুইনক্স	(এস কে এফ)	ফ্লোক্সিন	(ফার্মাদেশ)
সার্ভিফ্লক্স	(নোভারটিস)	নিওফ্লক্সিন	(বেক্সিমকো)
সিপ্রোজিড	(ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল)	ফ্লোন্টিন	(রেনেটা)
সিপ্রক্স	(অপসোনিন)	ম্যাপ্রসিন	(ওরিয়ন)

টেবলেট প্রতিটি ২৫০ মিঃ গ্রাঃ

টেট্রাসাইক্লিন/অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ক্যাপসুল

ব্যবহারের মাত্রা

ক্যাপসুল ২৫০ মিলিগ্রামের ১টা করে ৬ ঘন্টা পর পর ৫-১০দিন।
যে কোন সংক্রমণে এই মাত্রা দ্বিগুণ বা আরও বেশীদিন ব্যবহার করতে হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হবে।

কিভাবে পাওয়া যায়–
ক্যাপসুল ২৫০ মিলিগ্রাম

ব্যবহারের বিবরণ

এটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী ওষুধ। অনেক ধরনের সংক্রমণে এটা কাজ করে। এর ব্যবহার অনেকটা এমপিসিলিনের ব্যবহারের মতই। চামড়ার বিভিন্ন ঘা, পাঁচড়া, পাকা কফযুক্ত কাশি, নিউমোনিয়া, গলার প্রদাহ, কিডনী (বৃক্ক), মূত্রনালী এবং মূত্রথলীর সংক্রমণ, রক্ত আমাশয় (সিগেলাজনিত বা বেসিলারি ডিসেন্ট্রি বা আমাশয়)।

কলেরা, জরায়ুর সংক্রমণ প্রভৃতি রোগে এটি কার্যকরী। তবে টাইফয়েড রোগে এমপিসিলিনের মত এটা কাজ করে না।

জ্বর ও সেই সঙ্গে প্রস্রাবের রাস্তায় পুঁজ পড়লে এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিপদ ও সতর্কতা

● বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ ওষুধ ব্যবহার করলে তাদের দাঁতের ক্ষতি হয় বলে ১২ বৎসরের নীচে বাচ্চাদের এ ওষুধ দেয়া নিষেধ।

● গর্ভজাত শিশুর একই ধরনের ক্ষতি হতে পারে বলে গর্ভবতী মেয়েদের বিশেষ করে গর্ভকালের শেষের দিকে এ ওষুধ দেয়া উচিত নয়।

● পাণ্ডুরোগে (জণ্ডিস) আক্রান্তদের (এ সকল রুগীদের চোখ হলুদ ও সে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে প্রস্রাব হলুদ হয়) এ ওষুধ দেয়া উচিত নয়।

● যাদের যকৃতের রোগ আছে বলে জানা গেছে তাদের এ ওষুধ দেয়া উচিত নয়।

● অন্যান্য জীবাণু ধ্বংসকারী ওষুধের মত এ ওষুধও অনিয়মিত বা অপর্যাপ্ত সেবন ক্ষতিকর।

কয়েকটি বাজারজাত ওষুধের নাম

রেনামাইসিন ক্যাপসুল	(রেনেটা)
টেট্রাসিল ক্যাপসুল	(সিপলা)
টেট্রাজেন	(জেনারেল)
টেট্রাসিনা	(ইবনে সিনা)
ইমপেটেট	(এ.সি.আই)
অক্সিসিলিন	(এক্মি)
জেমাইসিন	(জেসন)
সার্ভিটেট	(নোভারটিস)

প্রাপ্যের অতিরুক্ত যে আশা করে তাকে নিরাশ হতে হয়।

-হযরত আলী (রাঃ)

ডক্সিসাইক্লিন ক্যাপসুল

ব্যবহারের মাত্রা

ক্যাপসুল

১০০ মিলিগ্রামের ২৪ ঘন্টায় ১টা ১ সপ্তাহ

গুরুতর সংক্রমণে ১ টা ক্যাপসুল ১২ ঘন্টা পরপর

কিভাবে পাওয়া যায় ঃ

ক্যাপসুল ১০০ মিলিগ্রাম

ব্যবহারের বিবরণ

টেট্রাসাইক্লিনের মতই অনেক ধরনের সংক্রমনে এটা কাজ করে। বিশেষ করে শ্বাসতন্ত্রে এবং মূত্রনালীর বিভিন্ন রকমের সংক্রমণে এগুলো কাজ করে। রক্ত আমাশয়ে এটা বেশ কার্যকর। মুখের ব্রনে এ ওষুধ দীর্ঘদিন(১২ সপ্তাহ বা বেশী) ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বিপদ ও সতর্কতা ঃ

টেট্রাসাইক্লিনের মতই সুবিধাঃ ২৪ ঘন্টায় ১ টা ক্যাপসুল

বাজারজাত কয়েকটি এ ওষুধের নাম

ডক্সিক্যাপ	(রেনাটা)
ডক্সিন	(অপসোনিন)
ওরিওডক্স	(ওরিয়ন)
সার্ভিডক্সিন	(নোভারটিস)
ফারডক্স	(ফার্মাদেশ)
ইমপেডক্স	(এ সি আই)
ডক্সিজেন	(জেনারেল)
ডক্সি-এ	(একমি)

কোট্রাইমোক্সাজল টেবলেট/সাসপেনশন

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

টেবলেট ২টা করে দিনে দুবার (৫–১০দিন)

শিশুদের ক্ষেত্রে–

সাসপেনশনঃ

৬ মাস–২ বৎসর ঃ $\frac{১}{২}$ চা-চামচ দিনে ২ বার

২–৫ বৎসর ঃ $\frac{১}{২}$ –১ চা-চামচ দ্রিনে ২ বার

৬–১২ বৎসর ঃ ১–২ চা-চামচ দিনে ২ বার

কিভাবে পাওয়া যায়–

টেবলেট ৪৮০ মিলিগ্রাম

সাসপেনশন ২৪০ মিলিগ্রাম প্রতি চা· চামচ

ব্যবহারের বিবরণ

এ ওষুধ জীবাণু সংক্রমণে খুব কার্যকরী। ইহা বেশী পরিমাণ জীবাণুর উপর কাজ করে। এ ওষুধ ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া রোগে ভাল কাজ করে। বৃক্ক (কিডনী), মূত্রনালী, মূত্রথলী এবং জননতন্ত্রের সংক্রমণে এ ওষুধ খুব কার্যকরী।

● এ ওষুধ খাওয়ার সময় অধিক পানি পান করা উচিত। তাহলে বৃক্কজনিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

বিপদ ও সতর্কতা

- কারো এলার্জি থাকলে ইহা ব্যবহার করা যাবে না।
- গর্ভাবস্থায় এ ওষুধ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।
- কিডনীর কোন রোগ যেমন পাথর বা অন্যান্য জটিলতা থাকলে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। ওষুধ সেবনের সময় অধিক পরিমাণ পানি পান করা উচিত, অন্যথায় বৃক্কে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ

কেমোট্রিম	(অপসোনিন)	সার্ভিট্রিম	(নোভারটিস)
এ্যাভলোট্রিন	(এ,সি,আই)	ডিট্রিম	(ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল)
ফাইসাট	(ফাইসন্স)	ট্রাইমোপ্রিম	(বেক্সিমকো)
ব্যাকটিপ্রন্ট	(রেনেটা)	জেসোট্রিম	(জেসন)
ওকট্রিম	(ওরিয়ন)	কোসাট	(এসকেএফ)
জেনট্রিম	(জেনারেল)	ফার্মাট্রিম	(ফার্মাদেশ)

- *মায়ের দুধই শ্রেষ্ঠ —এর বিকল্প নেই।*

মেট্রোনিডাজল টেবলেট/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের জন্য–

এমিবা আক্রমণে

টেবলেট ১–২টা (৪০০ মিলিগ্রামের) দিনে ৩ বার ৫–১০দিন।

ট্রাইকোমোনাস আক্রমণে

টেবলেট ১টা (২০০ অথবা ২৫০ মিলিগ্রামের) দিনে ৩ বার অর্থাৎ আট ঘন্টা পর পর, ৭ দিন ব্যবহার করতে হবে।

শিশুদের জন্য–

১–৫ বৎসর ঃ

সিরাপ ১ চা-চামচ দিনে ৩ বার অর্থাৎ আট ঘন্টা পর পর ৫-১০ দিন।

৬–১২বৎসর ঃ

টেবলেট ১–২(২০০ মিলিগ্রামের) দিনে ৩ বার ৫–১০ দিন। অথবা, ১–২ চা-চামচ সিরাপ দিনে ৩ বার ৫–১০দিন।

কিভাবে পাওয়া যায়–

টেবলেট ২০০, ২৫০ বা৪০০ মিলিগ্রামের। সিরাপ প্রতি চা চামচ ২০০ মিলিগ্রাম।

ব্যবহারের বিবরণ

● আমাশয় রোগ এদেশের একটি অতি পরিচিত ব্যাধি। বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর কারণে এটা হতে পারে যার মধ্যে এমিবা প্রধান, কেবলমাত্র এমিবাজনিত আমাশয়ে, এ ওষুধ কার্যকরী, বাদবাকী আমাশয়ে নয়। এ রোগের লক্ষণগুলো হচ্ছে পায়খানা নরম বা পাতলা দিনে দুই তিন বা আরও বেশী (৮–১০ বারের বেশী নয়) হতে পারে। আবার কয়েক দিন শক্ত, কয়েকদিন পাতলা পায়খানা পর পর হতে পারে। সঙ্গে মিউকাস (পিচ্ছিল তরল আঠাজাতীয় পদার্থ) থাকতে পারে।

পায়খানা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে, কখনও কখনও পায়খানার সাথে সামান্য রক্তও দেখা যেতে পারে। তলপেটে ব্যথা হতে পারে কিংবা তলপেটে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হতে পারে।

● এমিবা দ্বারা যকৃত আক্রান্ত হলেও এ ওষুধ কার্যকরী। এক্ষেত্রে রুগী পেটের উপরিভাগের ডানপাশে ব্যথা অনুভব করে, জ্বর জ্বর ভাব বা বেশী জ্বর হতে পারে এবং জ্বর উঠানামা করে। পেটের উপরিভাগের ডান পাশে হাত দিলে কোন কোন সময় চাকার মত অনুভব হয়, তবে চোখ হলুদ বা জন্ডিস হয় না। এ ধরনের লক্ষণ বেশ কয়েকটি রোগেই হতে পারে বলে এক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

● অনেক মহিলা লিউকোরিয়া বা সাদা স্রাব ও সেই সঙ্গে যোনিদেশে চুলকানি রোগে ভোগে। একাধিক কারণে এটা হতে পারে যার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ট্রাইকোমোনাস ভেজাইনালিস দ্বারা সংক্রমণের কারণে। ট্রাইকোমোনাস ভেজাইনালিস সংক্রমণে এ ওষুধ রুগীর জন্য কার্যকরী। তবে এ ওষুধে রুগীর লক্ষণসমূহ ভাল না হলে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

বিপদ ও সতর্কতা

● এ ওষুধ অপর্যাপ্ত বা অনিয়মিত ব্যবহারে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না, ফলে বার বার রুগী একই রকম কষ্টে ভুগতে থাকে।

এ ওষুধ খেলে সাময়িকভাবে ক্ষুধামন্দা, মুখে তেতোভাব, বমি বমি ভাব, বমি, পেটে অস্বস্তিভাব ইত্যাদি হতে পারে। এসব অসুবিধায় বিপদের কিছু নেই এবং ওষুধ খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সেরে যায় বলে এসব ক্ষেত্রে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কয়েকটি বাজারজাত মেট্রোনিডাজলের নাম ঃ

ফ্লাজিল টেবলেট/সিরাপ	(রোন পোলেন্‌ক)
মেটসিনা	(ইবনে সিনা)
এমোট্রেক্স	(এ সি আই)
মেট্রিল টেবলেট/সিরাপ	(অপসোনিন)
মেট্রোজ	(সিপলা)
মেটকো	(এসকেএফ)
ফাইডাজল	(ফার্মাদেশ)
ফিলমেট	(বেক্সিমকো)
ভ্যারিজিল	(ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল)
নিডাজল	(ওরিয়ন)

সকালে দাঁতমাজা যেমন প্রয়োজন শোবার সময় দাঁত মাজা তেমনি প্রয়োজন। মনে রাখবেন সারাদিনের খাবার দাঁতের ফাঁকে কিছু কিছু জমে থাকে। কাজেই সকালের চেয়ে বরং শোবার আগে দাঁত পরিষ্কার বেশী প্রয়োজন।

ক্লোরোকুইন ফসফেট টেবলেট/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–
টেবলেট ৪টা প্রথমে, ২টা তার ৬ ঘন্টা পর, তারপর ১টা করে দিনে দুইবার, দুইদিন।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

১ বৎসরের নীচে ঃ

পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার আটভাগের একভাগ, একইভাবে।

১–৫ বৎসর ঃ

পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার চারভাগের একভাগ, একইভাবে।

৬–১২ বৎসর ঃ
টেবলেট ২টা প্রথমে, ১টা তার ৬ ঘন্টা পর, তারপর ১/২ খানা করে দিনে দুইবার, দুইদিন।

- উপরোক্ত মাত্রাসমূহ ম্যালেরিয়া রোগের জন্য।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক হিসাবে পূর্ণবয়স্কদের সপ্তাহে ২টি টেবলেট ও শিশুদের বয়স অনুপাতে তার অর্ধেক বা চারভাগের একভাগ পরিমাণ করে এ ওষুধ খাওয়াতে হবে।

কিভাবে পাওয়া যায়–
টেবলেট ২৫০ মিলিগ্রামের প্রতিটি (যার মধ্যে ১৫০ মিঃগ্রাঃ বেস থাকে)

ব্যবহারের বিবরণ

এটা ম্যালেরিয়া রোগের একটা ওষুধ। ম্যালেরিয়া জ্বরের একটা বিশেষ লক্ষণ হল এটা হঠাৎ করে আরম্ভ হয়। প্রতিদিন, একদিন, কিংবা দুইদিন পর পর জ্বর উঠে। বাকী সময়টা সাধারণতঃ জ্বর থাকে না। প্রথমে ১৫ মিনিট থেকে শুরু করে ঘন্টাখানেক শীতবোধ হয়। তারপর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠে। এই জ্বর ১০৪°–৫°

ফারেনহাইট বা তারও বেশী ওঠে এবং ঘন্টা কয়েক থাকে। মাথা ব্যথা হয়, বমি হতে পারে। তারপর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। আর কোন উপসর্গ যেমন কফ, কাশি, প্রস্রাব জ্বালাপোড়া ইত্যাদি থাকে না। বেশীদিন ভুগলে প্লীহা বড় হয়ে যায়, যা পেটের উপরিভাগের বামপাশে চাকার মত অনুভূত হয় এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

বেশীরভাগ ম্যালেরিয়া এ ওষুধে ভাল হয়ে যায়, তবে বাদবাকী ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার জন্য অন্যান্য ওষুধের প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো উচিত।

এছাড়া যেসব অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশী সেই সব এলাকায় প্রতিরোধক হিসেবে এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

হেপাটিক এমিবিয়াসিস্ বা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রোগে এ ওষুধ উপকারী হলেও এসব রোগে এ ওষুধের ব্যবহার উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা হওয়া উচিত।

বিপদ ও সতর্কতা

- এটি অল্পদিনের জন্য ব্যবহার নিরাপদ হলেও দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে চোখের ক্ষতি হতে পারে।
- গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে এ ওষুধ ব্যবহার উচিত নয়।

কয়েকটি বাজারজাত ক্লোরোকুইনের নাম

এভলোকুইন টেবলেট	(এ সি আই)
নিভাকুইন	(রোন পোলেন্ক)
জেসোক্লোর	(জেসন)
সি-কুইন	(অপসোনিন)

সালফাডক্সিন ও পাইরিমেথামিন টেবলেট

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

টেবলেট ৩টা একসাথে প্রথম দিন, তারপর ১টা করে দিনে দুইবার ৩ দিন।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

১ বৎসরের নীচে ঃ

পূর্ণবয়স্কদের মাত্রায় আট ভাগের এক ভাগ।

১–৫ বৎসর ঃ

পূর্ণবয়স্ক মাত্রার চারভাগের একভাগ।

৬–১২ বৎসর ঃ

পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার অর্ধেক।

কিভাবে পাওয়া যায়–

টেবলেট ২৫ মিলিগ্রাম পাইরিমেথামিন ও ৫০০ মিলিগ্রাম সালফাডক্সিন প্রতি টেবলেট।

ব্যবহারের বিবরণ

এ ওষুধ দুটি একত্রে সংযোজিত এবং ম্যালেরিয়া রোগে ব্যবহার করা হয়। আনুপাতিক হারে দুটির মিশ্রণে টেবলেট বাজারে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত পূর্বেই বলা হয়েছে। (ক্লোরোকুইনের ব্যবহার দেখুন।)

ক্লোরোকুইন প্রয়োগে বেশীর ভাগ ম্যালেরিয়া ভাল হলেও অনেক ক্ষেত্রে এতে ফল হয় না। অত্যন্ত সহজ ব্যবহারবিধি ও নিরাপদ বলে এ ওষুধ বিকল্প হিসেবে গ্রাম পর্যায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

সালফামিন	(জেসন)	সালোপ্রিম	(অপসোনিন)
ফেনসিডার টেবলেট	(রোচি)		

এমাইনোফাইলিন টেবলেট/ইনজেকশন

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

টেবলেট ১–২টা দিনে ৩–৪বার, শ্বাসকষ্ট ভাল না হওয়া পর্যন্ত। ইনজেকশন ১ এম্পুল শিরায়; ৬–৮ ঘন্টা পরে পুনরায় দেয়া যেতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

১ বৎসরের নীচে ঃ

পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার আট ভাগের এক ভাগ

১–৫ বৎসর ঃ

পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার চার ভাগের এক ভাগ

৬–১২ বৎসর ঃ

পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার অর্ধেক

শ্বাসকষ্টের মাত্রা কমে গেলে ইনজেকশন বন্ধ করে টেবলেট দিতে হবে।

কিভাবে পাওয়া যায়–

টেবলেট ১০০ মিলিগ্রামের প্রতিটি। ইনজেকশন ২৫০ মিলিগ্রামের প্রতিটি এম্পুল।

ব্যবহারের বিবরণ

হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টে এ ওষুধ কার্যকরী। হাঁপানী বা শ্বাসকষ্ট সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে, যা ফুসফুসজনিত বা হৃদপিণ্ডজনিত কারণে হতে পারে (ইফেড্রিনের ব্যবহার দেখুন)। উভয়ক্ষেত্রে এটা নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। তবে ফুসফুসজনিত হাঁপানীতে এটা সবচেয়ে বেশী কার্যকর। অল্প শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে টেবলেট আর গুরুতর ক্ষেত্রে ইনজেকশন শিরায় ব্যবহার করা উচিত।

ফুসফুসজনিত, হাঁপানী প্রধানতঃ বংশগত কারণে বা নানা ধরনের এলার্জি থেকে হতে পারে। এই এলার্জির মধ্যে রয়েছে ধুলাবালি, যে কোন ধরনের ধোঁয়া, বিশেষ করে ধূমপান, কোন কোন খাবার যেমন ডিম, গরুর মাংস, চিংড়ি মাছ, চকলেট ইত্যাদি, অত্যাধিক শীত বা গরম, দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগেও এটা বাড়তে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে রুগীই সঠিক কারণটি খুঁজে বের করতে পারে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক

কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এসব কারণ ছাড়াও নানা জীবাণুর সংক্রমণের ফলে এটা হতে পারে।

এ রোগের লক্ষণসমূহ হচ্ছে দিনে বা রাতে যে কোন সময়ে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। অনেক সময় রুগীর কাছে গেলে শ্বাসের টানা শাঁ শাঁ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। রুগী শুয়ে, বসে, কোন অবস্থাতেই আরাম পায় না। শ্বাসকষ্ট বেশী হলে শ্বাসের সাথে সাথে পাঁজরের হাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলো ভেতরের দিকে চলে যায়। এগুলো ছাড়া শুকনো বা আঠাল সাদা বা হলুদ কফযুক্ত কাশি থাকে। সঙ্গে জ্বরও হতে পারে।

ক্রনিক ব্রংকাইটিস রুগীরা কখন কখনও শ্বাসকষ্টে ভুগে, সেক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট কমাতে এ ওষুধ দেয়া যেতে পারে। এ রোগ সাধারণতঃ বয়স্ক, বিশেষ করে যারা ধূমপান করেন তাদের হয়ে থাকে। বছরে তিনমাস বা তারও অধিককাল কাশি পরপর দুই বা ততোধিক বৎসর লেগে থাকলে এবং রুগীর স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটালে সেটাকে ক্রনিক ব্রংকাইটিস বলা যায়। তবে 'অনেক দিনের কাশি মাত্রই ক্রনিক ব্রংকাইটিস' এটা বলা ঠিক নয়। তাই এক্ষেত্রে উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

বিপদ ও সতর্কতা

- টেবলেট নিরাপদ।
- এমাইনোফাইলিন ইনজেকশন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দেয়া প্রয়োজন। এ ইনজেকশন শিরায় অত্যন্ত ধীরগতিতে দেয়া উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে একটু দ্রুতগতিতে দিলেই রুগীর অস্বাভাবিক দ্রুত নাড়ীর স্পন্দন, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি, বুক ধড়ফড়, অস্থিরতা, খিঁচুনি ইত্যাদি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
- কখনও এ ইনজেকশন দ্রুত দেয়া উচিত নয় এবং দেয়ার সময় উক্ত লক্ষণসমূহ দেখা দিলে এটা আর না দেয়া উচিত।

--

কয়েকটি বাজারজাত ওষুধের নাম

ফিলিন টেবলেট	(অপসোনিন)
কার্ডোফাইলিন	(ফাইসন্স)

ইফেড্রিন টেবলেট/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–
টেবলেট ১/২–২ টা করে দিনে ৩ বার

শিশুদের ক্ষেত্রে–
১ বৎসরের নীচে ঃ টেবলেট ১/৮টা দিনে ৩ বার

১–৫ বৎসর টেবলেট ঃ ১/৪–১/২ টা দিনে ৩ বার

৬–১২ বৎসর ঃ টেবলেট ১/৪–১টা করে দিনে ৩ বার
শ্বাসকষ্ট ভাল হয়ে গেলে এ ওষুধ দেয়া বন্ধ করতে হবে।

কিভাবে পাওয়া যায়–
টেবলেট ৩০ মিলিগ্রামের প্রতিটি।

ব্যবহারের বিবরণ

এটি এক কথায় হাঁপানির ওষুধ। যে কোন বয়সের মানুষ হাঁপানিতে আক্রান্ত হতে পারে। হাঁপানি ফুসফুসজনিত বা হৃদপিণ্ডজনিত হতে পারে। কেবলমাত্র ফুসফুসজনিত হাঁপানির জন্য এ ওষুধ, হৃদপিণ্ডজনিত হাঁপানির জন্য নয়।

ফুসফুসজনিত হাঁপানির কারণ হচ্ছে শ্বাসনালীর সংকীর্ণতা, তবে স্থায়ী নয়, অস্থায়ী। এ ওষুধ মূলতঃ শ্বাসনালীকে খুলে দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসে সহায়তা করে ও শ্বাসকষ্ট কমায়।

● সর্দিতে বন্ধ নাকের উপশমে ইফেড্রিন ড্রপ বা ফোঁটা ব্যবহার করা যায়। চা-চামচের এক চামচ পানিতে একটি টেবলেট গুলে এটা বানান যায়। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষতিকর।

বিপদ ও সতর্কতা

● ফুসফুসজনিত হাঁপানির উপশমে এ ওষুধ যেমন উপকারী, হৃদপিণ্ডজনিত হাঁপানিতে এটা তেমন বিপদজনক হতে পারে।

● যাদের উচ্চরক্তচাপ, কিছুদূর হাঁটলে বুকে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করে বা পায়ে পানি আসে কিংবা আগে কোন এক সময়ে হৃদপিণ্ডের অসুখ হয়েছে বলে জানা আছে, তাদের বেলায় ইফেড্রিন প্রয়োগ করা নিষেধ। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ডের অসুখে ইফেড্রিন দেয়া গেলেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত।

● হাঁপানি ফুসফুসজনিত না হৃদপিণ্ডজনিত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলে এ ওষুধ ব্যবহার করা ঠিক নয়।

বাজারজাত ওষুধের নাম

ইফেড্রিন টেবলেট	(জেসন)

মাটি, পানি ও খাদ্যে আয়োডিনের অভাব রয়েছে এমন এলাকায় জন্ম হলে শিশু মানসিক ও দৈহিক প্রতিবন্ধী হতে পারে। গর্ভবতী মা পর্যাপ্ত আয়োডিন না পেলে তার গর্ভপাত ও মৃত সন্তান প্রসবের মারাত্মক ঝুঁকি থাকে।

সালবিউটামল টেবলেট/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

টেবলেট ২ মিলিগ্রাম ১–২টা করে দিনে ৩ বার অথবা ৪ মিলিগ্রাম ১টা করে দিনে ৩ বার।

ইনহেলার ২ পাফ (টান) করে দিনে ৩–৪ বার অথবা প্রয়োজনবোধে।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

২-৬ বৎসর ঃ

সিরাপ ১/২ চা-চামচ ২–৩ বার

৬–১২ বৎসর ঃ

টেবলেট ২ মিলিগ্রাম ১টা করে দিনে ২–৩ বার

সিরাপ ১ চা-চামচ দিনে ২–৩ বার

কিভাবে পাওয়া যায়–

টেবলেট ২ মিলিগ্রাম অথবা ৪ মিলিগ্রাম প্রতিটি

সিরাপ ২ মিলিগ্রাম প্রতি চা-চামচ

ব্যবহারের বিবরণ

এটা শ্বাসকষ্টজনিত রোগে উপকারী। সাধারণতঃ এ ওষুধ হাঁপানি, অনেকদিনের শ্বাসকষ্ট (ক্রনিক ব্রংকাইটিস) এবং অন্যান্য শ্বাসকষ্টে খুবই ফলপ্রদ।

হাঁপানিতে টেবলেটের চাইতে ইনহেলার বেশী উপকারী। এতে কোন বিপদ নাই।

বিপদ ও সতর্কতা

● হাঁপানি রোগে এটা একটা নিরাপদ ওষুধ। কখনও উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসাকালীন প্রোপ্রানোলল এর সাথে এ ওষুধ দেয়া উচিত নয়। গর্ভের শেষ দিকে এ ওষুধ দেয়া ঠিক নয়। ডায়বেটিস এবং থাইরয়েড গ্রন্থির রোগে এ ওষুধ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ

সালবিউনিল	(জনসেবা)
ভেন্টোলিন	(গ্লাক্সো-ওয়েলকাম)
সালবিউটাল	(ফাইসন্স)
বিউটল	(সিপলা)
ব্রডিল	(এ সি আই)
এসমোলিন	(ফার্মাদেশ)
রেসপোলিন	(জেসন)
পালমোলিন	(অপসোনিন)
সালমোলিন	(একমি)
সালবুট	(জেনারেল)
ব্রনকোলাক্স	(বেক্সিমকো)

মাটি, পানি ও খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি রয়েছে এমন এলাকার শিশুরা আয়োডিন সমৃদ্ধ এলাকার শিশুদের চেয়ে কম বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

ডেক্সট্রোমেথরফ্যান সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–
১–২ চা-চামচ দিনে ২–৩ বার

শিশুদের ক্ষেত্রে–
ব্যবহার উপযোগী নয়।

কিভাবে পাওয়া যায়–
১০ মিলিগ্রাম প্রতি চা-চামচে

ব্যবহারের বিবরণ

এ ওষুধ শুষ্ক কফ, ঘন ঘন কাশি, কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা এমন অবস্থায় উপকারী। যখন কেউ ঘন ঘন কাশির কারণে ঘুমাতে পারে না, তখন এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। মনে রাখতে হবে সব কাশিতে যেমন ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদিতে এ ওষুধ ব্যবহার করলে উপকারের চেয়ে অপকারের সম্ভাবনাই বেশী। কারণ কাশি বন্ধ হলে বুকে কফ জমে থাকবে এবং রোগ নিরাময় হতে সময় অনেক বেশী লাগবে।

বিপদ ও সতর্কতা

- সাধারণতঃ যে সমস্ত রুগীর হাঁপানি এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- এ ওষুধে অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, (যদি বেশী মাত্রায় সেবন করা হয়)।

বাজারজাত ওষুধ

ডেক্সট্রোমেথরফ্যান	(বেক্সিমকো)
ডেক্সট্রোমেথরফ্যান	(ওরিয়ন)

প্রোমেথাজিন টেবলেট/সিরাপ/ইনজেকশন

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–
টেবলেট ১০ মিলিগ্রামের ১–৩টা দিনে ৩–৪ বার অথবা
২৫ মিলিগ্রামের ১টা করে দিনে ৩-৪ বার।
ইনজেকশন ১ এম্পুল মাংসে ৬–৮ঘন্টা পর পর (কেবল মাত্র গুরুতর ক্ষেত্রে)।

শিশুদের ক্ষেত্রে–
১ বৎসরের নীচে ঃ
সিরাপ ১/২ চামচ দিনে ২–৪ বার
প্রয়োজনে উপরোক্ত মাত্রা কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ান যেতে পারে।

১–৫ বৎসর ঃ
সিরাপ ১-২ চামচ দিনে ৩–৪ বার
ইনজেকশন ১/২ এম্পুল মাংসে ৬–৮ ঘন্টা পর পর।

৬–১২ বৎসর ঃ
টেবলেট ১০ মিলিগ্রামের ১–২টা দিনে ৩–৪ বার
ইনজেকশন ১/২ এম্পুল মাংসে ৬–৮ ঘন্টা পর পর।

কিভাবে পাওয়া যায়–
টেবলেট ১০ বা ২৫ মিলিগ্রামের প্রতিটি
সিরাপ প্রতি চা চামচে ৫ মিলিগ্রাম
ইনজেকশন ৫০ মিলিগ্রামের প্রতি এম্পুল

ব্যবহারের বিবরণ

নানা ধরনের এলার্জিতে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এলার্জি ধুলাবালি, কোন কোন খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ ইত্যাদি থেকে হতে পারে।

এলার্জির কারণে নাকে সর্দি হয় কিংবা নাক দিয়ে পানি পড়ে, ঘন ঘন হাঁচি হতে পারে। এগুলো সাধারণতঃ হঠাৎ করে শুরু হয়। রুগী অনেক সময় বলতে পারে যে ধুলাবালি বা এ ধরনের অন্য কিছুতে তার সর্দি হয়।

তাছাড়া এলার্জির কারণে শরীর চুলকিয়ে বিভিন্ন আকারের চাকা চাকা হয়ে চামড়া ফুলে উঠতে পারে (আমবাত) কিংবা দানা দানা দেখা দিতে পারে। আবার চামড়ায় টান পড়ে টন টন করে ব্যথা করতে পারে। তবে এই ব্যথার পরিমাণ ফুলার তুলনায় অন্যান্য প্রদাহজনিত ব্যথার চেয়ে অনেক কম।

● নানা কারণে গা চুলকালে সাময়িক উপশমের জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

● মোটরগাড়ী, ষ্টীমার অথবা বিমানে ভ্রমণ করলে অনেকের বমি বমি ভাব, মাথাঘুরা, এমনকি বমিও হতে পারে। এ লক্ষণসমূহের উপশমের জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

এলার্জির পরিমাণ এবং বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে এ ওষুধ হয় মুখে খাওয়া কিংবা ইনজেকশন আকারে দেওয়া যেতে পারে।

বিপদ ও সতর্কতা

● এ ওষুধ তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

● এ ওষুধ ব্যবহারে কেউ কেউ ঝিমান, কাজ কর্মে অসুবিধা বোধ করেন। আবার কারও কারও নাকমুখ শুকিয়ে যায় বলে অনুভব করেন। অনিদ্রার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

মেথাজিন	(জনসেবা)	ফেনেরেক্স	(জেসন)
ফেনারগান	(রোন পোলেন্ক)	অটোসিল	(অপসোনিন)
প্রোমেসটিন	(ফার্মাদেশ)	এলারগান	(সিপলা)
প্রোজিন	(এস কে এফ)		

ইসলামের দৃষ্টিতে তামাক ও ধূমপান হারাম

ক্লোরফেনিরামিন টেবলেট/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–
টেবলেট ৪ মিলিগ্রামের ১টা দিনে ৩-৪ বার

শিশুদের ক্ষেত্রে–
৬–১২ বৎসর ঃ
টেবলেট ৪ মিলিগ্রামের ১/২–১টা দিনে ২–৩ বার
সিরাপ ১/২–১ চা-চামচ দিনে ২–৩ বার।

কিভাবে পাওয়া যায়–
টেবলেট ৪ মিলিগ্রাম প্রতিটি।
সিরাপ প্রতি চা-চামচ ২ মিলিগ্রাম।

ব্যবহারের বিবরণ

বিভিন্ন ধরনের এলার্জিতে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ধুলাবালি, কোন কোন খাদ্যদ্রব্য এবং কোন কোন ওষুধ থেকে এলার্জি হতে পারে।

এ কারণে সর্দি হয় কিংবা নাক দিয়ে পানি পড়া, ঘন ঘন হাঁচি হতে পারে। রুগী অনেক সময় বলতে পারে ধুলাবালি বা এ ধরনের অন্য কিছুতে তার সর্দি হয়। এলার্জির কারণে বিভিন্ন আকারের চাকা চাকা হয়ে চামড়া ফুলা কিংবা দানা দানা দেখা দিতে পারে। এতে চুলকায়।

আবার কোন কোন সময় হাত, পা, মুখ কিংবা শরীরের অন্য কোন অংশ বেশ ফুলে যেতে পারে। চামড়ায় টান পড়ে, টন টন করে ব্যথা করতে পারে। ফুলার অনুপাতে চাপ দিলে ব্যথা অনেক কম কিম্বা একেবারে হয় না। আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে অন্য কারণে ফুলার মত গর্ত হয়ে যায় না। অন্যান্য কারণে গা চুলকালেও সাময়িকভাবে উপশমের জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিপদ ও সতর্কতা

- এ ওষুধের খুব বেশী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।
- এ ওষুধ ব্যবহার করার ফলে ঘুম ঘুম ভাব বা ঝিমিয়ে পড়তে পারেন। আবার কখনও কখনও নাক মুখ শুকিয়ে যায় বলেও মনে হয়।
- এ ওষুধ ব্যবহারের ফলে বয়স্কদের ক্ষেত্রে মূত্র ত্যাগ দেরী হতে পারে।
- এ ওষুধ সেবনকারীদের মটর গাড়ী, মেশিন চালাতে সাবধান হওয়া উচিত।
- মৃগী রোগে এ ওষুধ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।
- অনিদ্রার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ

হিষ্টাসিন	(জেসন)	ইরামিন	(ফার্মাদেশ)
হিসটাল	(অপসোনিন)	হিসটালেক্স	(একমি)
এলারমিন	(রেনেটা)	হিসটাজেন	(জেনারেল)
পিরিটন	(গ্লাক্সো-ওয়েলকাম)	এন্টিহিসটা	(সিপলা)
সিনামিন	(ইবনে সিনা)	ক্লোরামিন	(ওরিয়ন)

পরিবারের সবাই প্রতিদিন আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পারে। রান্না ও খাবারে সবসময় আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করা উচিত। আয়োডিনযুক্ত লবণ নিরাপদ ও কার্যকর।

মেবেনডাজল টেবলেট/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

টেবলেট ১টা করে দিনে ২ বার অর্থাৎ বার ঘন্টা পর পর তিন দিন খেতে হয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

২ বছরের নীচে ঃ না দেওয়া ভাল।

২–১২ বৎসর ঃ

টেবলেট ১টা করে দিনে ২ বার পর পর তিন দিন।

সিরাপ ১চা চামচ দিনে ২ বার পর পর তিন দিন।

কিভাবে পাওয়া যায় –

টেবলেট ১০০ মিলিগ্রামের প্রতিটি

সিরাপ প্রতি চা চামচে ১০০ মিলিগ্রাম।

চামচ-সব সিরাপের ক্ষেত্রে চায়ের চামচ বুঝাবে।

প্রতি চায়ের চামচে পাঁচ মিলিলিটার সিরাপ ধরে।

ব্যবহারের বিবরণ

- একাধিক কৃমির আক্রমণে এটা উপকারী যেমন–বক্র কৃমি বা হুকওয়ার্ম, কেঁচোকৃমি বা রাউন্ডওয়ার্ম, সুতাকৃমি বা থ্রেডওয়ার্ম ও চাবুক-কৃমি বা হুইপওয়ার্ম।

বক্রকৃমি ঃ

এই কৃমি ক্ষুদ্র (বক্রাকার)। কিন্তু আমাদের পেট (অন্ত্র) থেকে রক্ত শোষণ করে বলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। এ কৃমির ডিম পায়খানার সাথে বের হয়ে মাটিতে মিশে। এই ডিম থেকে কৃমির জন্ম হয়। যা খালি পায়ে হাটলে, পায়ের চামড়া ভেদ করে শরীরে ঢোকে। ফলে পায়ে সামান্য চুলকানী বা লালমত দেখা দিলেও বেশীর ভাগ সময় তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে। পরবর্তীতে এটা পেটে গিয়ে পৌছে। এ সমস্ত রুগী নানান পেটের অসুবিধায় ভোগে। পেট ফাঁপা, অস্বস্তিকরভাব বা নরম পায়খানা

হতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে রক্তশূন্যতার জন্য রুগী দুর্বল হয়ে পড়ে ফ্যাকাশে ভাব, ক্ষুধা মন্দা, বুক ধড়ফড়, বা পরিশ্রম করলে দম আটকে আসা, পা ফুলা ইত্যাদি হতে পারে। রক্তশূন্যতার অন্যান্য লক্ষণ আগেই বলা হয়েছে।

কেঁচোকৃমি

কেঁচোকৃমি হলে অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েদের পেটে ব্যথা, মাঝে মধ্যে বমি, অনিয়মিত পাতলা পায়খানা, কারও কারও বমি কিংবা পায়খানার সাথে জীবিত অথবা মৃত কৃমি বেরিয়ে আসে, এমনকি নাক দিয়েও বের হতে পারে। কোন কোন সময় পেট ব্যথার সাথে চাকার মতও কিছু হাতে ধরা পড়তে পারে, অনেকগুলো কৃমি এক জায়গায় জমে এ অবস্থার সৃষ্টি করে।

সুতাকৃমি

দেখতে সুতার মত বলেই এ নাম। পায়খানার রাস্তায় চুলকানি এর বিশেষ লক্ষণ, বিশেষ করে রাতের বেলায় এ কৃমিগুলো পায়খানার রাস্তার চারপাশে এসে ডিম পাড়ে এবং সে কারণেই এই চুলকানি হয়, রাতে পায়খানার রাস্তার আশে পাশে এ কৃমিগুলো দেখা যেতে পারে। বাড়ীতে একজনের হলে অন্যান্যদের মধ্যে খুব সহজেই এটা সংক্রমিত হয়ে পড়ে। ওষুধ খাওয়ার সাথে সাথে পরিধেয় কাপড়, বিছানাপত্র ধুয়ে ফেলা ও রৌদ্রে শুকানো প্রয়োজন। তা না হলে পুনরায় সেখান থেকে এ কৃমি পেটে যাবে। দুই সপ্তাহ পর এ ওষুধ দ্বিতীয়বার খাওয়ানো উচিত।

- অপরিষ্কার হাতে খাদ্যগ্রহণ বা অপরিষ্কার হাতের সংস্পর্শে আসা খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় গ্রহণের মাধ্যমে এ কৃমিগুলির ডিম আমাদের পেটে যায়, তাই রুগীকে এ অভ্যাস বর্জনের পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন।

- বাড়ীর সব সদস্যদের একসঙ্গে এর চিকিৎসা দেওয়া উচিত।

চাবুক কৃমি ঃ

এই কৃমি দেখতে অনেকটা চাবুকের মত বলে এ নাম। এ কৃমির ডিম পায়খানার সাথে বের হয়ে মাটিতে মিশে। এই ডিম খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশে আমাদের পেটে যায়, বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন কাঁদামাটি দিয়ে খেলা করে ও সে হাত মুখে দেয়। এই কৃমিতে আক্রান্ত পেট ফাঁপা, অস্বস্তিকরভাব বা নরম পায়খানা হতে পারে।

● আমাদের দেশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হেতু একাধিক ধরনের কৃমির আক্রমণ ঘটে। এ দেশে উপরোক্ত কৃমিগুলোর প্রকোপ অত্যন্ত বেশী এবং বেশীরভাগ লোকই একাধিক কৃমিতে আক্রান্ত হয়। এ ওষুধ তাই অত্যন্ত উপকারী এবং প্রয়োজনে প্রতি ছয়মাসে একবার করে খাওয়া উচিত।

বিপদ ও সতর্কতা

● এ ওষুধ নিরাপদ, তবে গর্ভবতী মেয়েদের এ ওষুধ না দেওয়া উচিত।

● মনে রাখতে হবে শুধু ওষুধ খাওয়ালেই চলবে না, রুগীকে অপরিষ্কার হাতে খাদ্যদ্রব্য বর্জনের ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চলার পরামর্শ দিতে হবে।

কয়েকটি বাজরজাত এ ওষুধের নাম

মেবেনটার	(জনসেবা)
সোলাস	(অপসোনিন)
মেবেন	(ফাইসন্স)
মেবানট্রিন	(ফার্মাদেশ)
প্যানামক্স	(জেসন)
ভারমিজিন	(ওরিয়ন)

এলবেনডাজল টেবলেট

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে -

টেবলেট ১টি করে দিনে ৩ বার অথবা ২বার

কিভাবে পাওয়া যায়

৪০০ মিলিগ্রামের টেবলেট

ব্যবহারের নিয়ম -

হাইডাটিড রোগে বিশেষ উপকারী। এছাড়া রাউন্ড ওয়ার্ম বা কেঁচোকৃমি, সুতাকৃমি বা থ্রেডওয়ার্ম, চাবুককৃমি বা হুইপওয়ার্ম আক্রমণে এটা উপকারী।

হাইডাটিড রোগে

৪০০ মিঃ গ্রামের টেবলেট দিনে ২ বার করে ২৮ দিন। তারপর ১৪ দিন ওষুধ বন্ধ রেখে আবার ২৮দিন। এভাবে ৩ বার। রোগের অপারেশন প্রয়োজন হলে তার আগে ১টি কোর্স দিতে হবে।

অন্য কৃমিগুলোর আক্রমণে-

শুধু ১টি টেবলেট একবার খেলেই যথেষ্ঠ। তবে বেশী কৃমি থাকলে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

বিপদ ও সতর্কতা- গর্ভবতী মেয়েদের এ ওষুধ না দেওয়া উচিত।

কয়েকটি বাজারজাত ওষুধের নাম -

এ্যালবেন	(এসকেএফ)	ইষ্টাজল	(ইবনে সিনা)
এলবিজল	(অপসোনিন)	এলজেড	(জেনারেল)
এলফিন	(বেক্সিমকো)	বেন-এ	(একমি)
এলেনটিন	(রেনাটা)	সিনটেল	(এ সি আই)

বেনজাইল বেনজয়েট মলম

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

প্রথম দিন খুব ভাল ভাবে গোসল করে নিন। শরীর পুরোপুরি শুকিয়ে নিন। তারপর মাথা এবং ঘাড় ব্যতীত সমস্ত শরীরে (যেখানে চুলকানি নেই সেখানেও) ওষুধ লাগতে হবে। দ্বিতীয় দিনও প্রথম দিনের নিয়মে ওষুধ লাগান। গোসল করে সিদ্ধ করে অথবা ধোপা থেকে আনা কাপড় ব্যবহার করুন।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

১ বৎসরের নীচে ঃ একভাগ ওষুধ ও ৩ ভাগ পানি মিশিয়ে একই ভাবে লাগাতে হবে।

১–১২ বৎসর ঃ একভাগ ওষুধ ও একভাগ পানি মিশিয়ে একই ভাবে (পূর্ণ বয়স্কদের মত) লাগাতে হবে।

কিভাবে পাওয়া যায়–

ইমালশন ২৫% বেনজাইল বেনজয়েট

ব্যবহারের বিবরণ

চুলকানি (খাজুলি), পাঁচড়া রোগে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। চর্মরোগের মধ্যে খাজুলির প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী। খাজুলি অতিসংক্রামক রোগ। অন্যের সংস্পর্শে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ পরিবারের সকলেই একইসাথে এ রোগে আক্রান্ত হয়। চুলকানি এ রোগের প্রধান লক্ষণ এবং রাত্রে চুলকানি তীব্রতর হয়। চুলকানির পর চামড়ার উপর ছোট ছোট পানিসমেত গুটি দেখা দিতে পারে। প্রধানতঃ হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে, কব্জিতে, বগলের ভাঁজে, শরীরের বিভিন্ন ভাঁজে এবং যৌনাঙ্গে চুলকানি বেশী দেখা দেয়। সাধারণতঃ বয়স্কদের মাথা, মুখ, ঘাড়, হাত ও পায়ের তালুতে এ রোগ হয় না। কিন্তু শিশুদের বেলায় যে কোন স্থানে হতে পারে। অনেক সময় দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে এ রোগ থেকে ফোঁড়া, কিডনী (বৃক্ক) প্রদাহ, একজিমা সদৃশ রোগ হতে পারে।

● যদি ফোঁড়া দেখা দেয় তাহলে এন্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন বা ক্লক্সাসিলিন) দিয়ে চিকিৎসা করে অতঃপর পুঁজ না থাকলে ওষুধ লাগাতে হবে।

পরিবারের সকল সদস্যকে একসাথে চিকিৎসা করতে হবে। তা নাহলে একজন থেকে আর এক জনের আবার হতে পারে।

বিপদ ও সতর্কতা

● ব্যবহারের সময় এ ওষুধ চোখে লাগলে চোখ জ্বালাপোড়া করে এবং লাল হয়ে যায়। তাই সতর্ক থাকতে হবে।

এ ওষুধ ব্যবহারের পর অল্প সময়ের জন্য চামড়া জ্বালাপোড়া করতে পারে। এতে ভয়ের কিছু নেই।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

স্কাবিউল	(রোন পোলেন্‌ক)
স্কাবিসল	(জেসন)
লোট্রিক্স	(গ্লাস্কো-ওয়েলকাম)

চর্মরোগীর একই বিছানায় শোবেন না। তার কাপড় এবং চিরুনী ব্যবহার করবেন না। বহু চর্মরোগ যেমন দাদ, চুলকানি ইত্যাদি ছোঁয়াচে।

বেনজয়িক এসিড এবং সেলিসাইলিক এসিডের মিশ্রণ

ব্যবহারের মাত্রা

দৈনিক দুবার ক্ষতস্থানে ৬–১২ সপ্তাহ্ পর্যন্ত

কিভাবে পাওয়া যায়–
বেনজয়িক এসিড ৬%
সেলিসাইলিক এসিড ৩%
ভেসিলিন এক আউন্স
তিনটা মিশিয়ে মলম তৈরী হয়।

ব্যবহারের বিবরণ

এ ওষুধ শুধুমাত্র দাদ রোগে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে দেহ, হাত ও পায়ের দাদ রোগে এটা উপকারী।

দাদ রোগে সাবান, সোডা, ডেটল/স্যাভলন ব্যবহার করলে রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

ঘামযুক্ত কাপড় সাথে সাথে পবিরর্তন করতে হবে।

কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখতে হবে।

বিপদ ও সতর্কতা

এ ওষুধের তেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। তবে শুধু মাত্র এটা লাগানোর পর স্বল্প সময়ের জন্য একটু জ্বালা পোড়া অনুভূত হতে পারে।

বাজারজাত ওষুধ

হুইটফিলড মলম	(জেসন)
জেনাফিল্ড মলম	(জেনারেল)

গ্রাইসোফুলভিন টেবলেট/সিরাপ

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–
টেবলেট ১টা করে দিনে ১ বার ৩–৬ সপ্তাহ

শিশুদের ক্ষেত্রে–
প্রতি কেজি ওজনে ১০ মিলিগ্রাম, প্রতিদিন একবার ৩–৬ সপ্তাহ

কিভাবে পাওয়া যায়–
টেবলেট ৫০০ মিলিগ্রামের প্রতিটি
সিরাপ ১২৫ মিলিগ্রাম প্রতি চা-চামচে

ব্যবহারের বিবরণ

এ ওষুধ দাদ রোগে খুবই কার্যকরী। দাদ চর্মরোগের মধ্যে একটি প্রধান রোগ। দেহের ত্বকে ও নখে এ রোগ হয়। শিশুদের মাথায়, বয়স্কদের দাঁড়িতে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গের আশে পাশে, পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে এ রোগ দেখা যায়। এ ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন ভাঁজে যেখানে ঘাম বেশী নিঃসৃত হয় সেসব স্থানে দাদ রোগ দেখা দেয়। এ রোগের লক্ষণ শুরু হয় চুলকানি দিয়ে। আক্রান্ত জায়গায় গুটি গুটি দানাকৃতির গোলাকার হয়ে দেখা দেয়। গোলাকৃতির মধ্যবর্তী স্থানের ত্বক দেখে সুস্থই মনে হয়। যখন ঘাম নির্গত হয় তখন আক্রান্ত জায়গায় অসহ্য চুলকানি শুরু হয়। আক্রান্ত এলাকায় চুল পড়ে যায়। হাত এবং পায়ের নখ বিবর্ণ হয়ে যায় এবং মসৃণতা নষ্ট হয়ে যায়।

সংক্রামক রোগ বিধায় রুগীর চিরুনী, মাথার টুপি, কাপড়-চোপড় অন্য কারো ব্যবহার করা উচিত নয়।

দাদ আছে এমন রুগীর ব্যবহার করা জুতা সুস্থ ব্যক্তির ব্যবহার করা উচিত নয়।

ডায়বেটিস রুগীদের যদি এ রোগ হয় তাহলে দাদ রোগের চিকিৎসার সাথে সাথে অবশ্যই ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

বিপদ ও সতর্কতা

এ ওষুধের তেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। অনেকটা নিরাপদ। তবে মাথা ব্যথা, বমি ভাব, বমি এবং ত্বকে লাল লাল গুটি দেখা দিতে পারে।

গর্ভবতী মাকে ও জণ্ডিস রোগে এ ওষুধ কোন অবস্থাতেই দেয়া উচিত নয়।

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ

গ্রাইসোভিন এফ পি	(গ্লাক্সো-ওয়েলকাম)
গ্রাইসোটিন	(জনসেবা)
ফুলসিনেক্স	(এ সি আই)
ফাইসোভিন	(ফাইসন্স)
অপসোভিন-এফ পি	(অপসোনিন)

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক।
নিজে পরিষ্কার থাকুন অপরকে পরিষ্কার থাকতে শিক্ষান।

ফ্লুকোনাজল ক্যাপসুল

ব্যবহারের মাত্রা ঃ

যৌন রোগে -

১৫০ মিঃ গ্রাঃ শুধু ১ বার

মুখে সংক্রমণঃ

৫০ মিঃ গ্রাঃ দিনে, ৭ – ১৪ দিন

চর্ম সংক্রমণঃ

৫০ মিঃ গ্রাঃ দিনে ২ – ৪ সপ্তাহ

ব্যবহারের বিবরণ ঃ

শরীরের বিভিন্ন অংগে ফাংগাসের সংক্রমণে ব্যবহার করা হয় , যেমন ঃ যৌনাঙ্গ, মুখ, চর্ম ইত্যাদি ।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঃ

বমি, জ্বর, ডায়ারিয়া, পেটে অস্বস্তি

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ ঃ

ওমেষ্টিন (বেক্সিমকো)
ফ্লুকোডার (এস কে এফ)
ফ্লুকোন (অপসোনিন)
ক্যানাজল (এ সি আই)

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখুন ।
ধুমপান বর্জন করুন ।
ধুমপানে প্রতি ১৩ সেকেন্ডে একজন মারা যায় ।

প্রোপ্রানোলল টেবলেট

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

টেবলেট ১–২টা দিনে ২–৩ বার

শিশুদের ক্ষেত্রে–

এ ওষুধ প্রয়োজন হয় না

কিভাবে পাওয়া যায়–

টেবলেট ১০ এবং ৪০মিলিগ্রামের প্রতিটি

ব্যবহারের বিবরণ

উচ্চ রক্তচাপে এ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এ ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে উচ্চ রক্তচাপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকতে হবে। উচ্চ রক্ত চাপের লক্ষণসমূহ–

মাথা ব্যথা, মাথা ভার, মাথা ঘুরানো, ঘাঁড়ে ব্যথা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, ঘন ঘন প্রস্রাব, বুক ধড়ফড় করা, কানে ভোঁ ভোঁ করা ইত্যাদি (উচ্চ রক্তচাপ দেখুন)

বিপদ ও সতর্কতা

- এ ওষুধ হাঁপানি, ব্রংকাইটিস অথবা হৃদপিণ্ডজনিত শ্বাসকষ্টের রুগীকে দেয়া বিপজ্জনক।
- যে সমস্ত রুগীর নাড়ীর গতি (Pulse) প্রতি মিনিটে ৬০ এর চেয়ে কম হয়, তাদেরকেও এ ওষুধ দেয়া যাবে না।
- গর্ভবতী মা, দুগ্ধবতী মায়ের ক্ষেত্রে এ ওষুধ ব্যবহার করা ভাল।
- এ ওষুধ ব্যবহারের পর যদি কারও শ্বাসকষ্ট হয় অথবা নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ৬০ এর চেয়ে কম হয়, তাহলে সাথে সাথে ওষুধ দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে।
- ডায়বেটিস রোগীকে এ ওষুধ না দেয়া উচিত।

বাজারজাত কয়েকটি ওষুধ

কার্ডিলল-১০,৪০ মিঃ গ্রাঃ(জনসেবা)   প্রোপানল (অপসোনিন)

ইনডেভার (এ সি আই)

● *ভোজনে ওজন* ● *ওজনে বিপদ* ● *প্রয়োজনের অধিক সবকিছুই ক্ষতিকর*

আর্গোমেট্রিন/মিথাইল আর্গোমেট্রিন ম্যালেট টেবলেট

ব্যবহারের মাত্রা

টেবলেট ০.২ থেকে ০.৫ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার অর্থাৎ আট ঘন্টা পর পর রক্তক্ষরণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত।

কিভাবে পাওয়া যায়–
টেবলেট ০.১২৫, ০.২, ০.২৫ ও ০.৫ মিলিগ্রামের প্রতিটি।

ব্যবহারের বিবরণ

এটা প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ বন্ধ করার ওষুধ। অনেক কারণে প্রসবের পরে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে। বাচ্চা প্রসব হয়ে যাবার পর অল্প রক্তক্ষরণ স্বাভাবিক। কিন্তু এটা স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিশেষ করে এদেশের মায়েদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠে। কারণ তাদের বেশীর ভাগই রক্তশূন্যতায় ভুগে। সঠিক সময়ে এর যথাযথ চিকিৎসা অনেক মাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

বাচ্চা প্রসবের পর আধসের বা তার বেশী রক্তক্ষরণ অস্বাভাবিক বলে বিবেচনা করা হয়। এর কম রক্তক্ষরণ যাই হোক না কেন তাতে শারীরিক অবনতি ঘটলে তাকেও অস্বাভাবিক বলে বিবেচনা এবং চিকিৎসা করতে হবে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের লক্ষণগুলো হল-প্রসবের রাস্তায় বড় বড় রক্তের চাকা, রুগীর নিস্তেজভাব, জিহবা শুকিয়ে যায় ও পিপাসা লাগে, এমনকি মাত্রার অধিক হলে নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত এবং ক্ষীণ হয়ে আসে এবং হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

প্রসবের পর সাধারণতঃ ৫ মিনিটি থেকে আধ ঘন্টার মধ্যে ফুল পড়ে যায়। এটা না পড়লে বা আংশিক ছিঁড়ে বের হয়ে আসলে কিংবা ফুল পড়ার পর জরায়ুর স্বাভাবিক সংকোচন না হলে এবং আরও অন্যান্য কারণে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে।

আর্গোমেট্রিন বা মিথাইল আর্গোমেট্রিন টেবলেট কেবলমাত্র অল্প বা মাঝারি ধরণের প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণে ব্যবহার করা উচিত। বেশী রক্তক্ষরণ হলে রুগীকে কালবিলম্ব না করে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো উচিত।

প্রসব পরবর্তী দেড়মাসকাল যে স্বাভাবিক স্রাব হয় তার পরিমাণ বেশী হলে সেক্ষেত্রে এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

● এছাড়া কাঁচা বাচ্চা নষ্ট হবার পর অনেক সময় অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয়। এর চিকিৎসা উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা করান দরকার। তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লাভের আগ পর্যন্ত রক্ত বন্ধের জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

বিপদ ও সতর্কতা

● এ ওষুধ একদিকে যেমন জীবনরক্ষাকারী, অন্যদিকে ভুল প্রয়োগের ফলে বিপজ্জনক অবস্থা হতে পারে। প্রসবের পূর্বে বা প্রসব পূর্ব রক্তক্ষরণে এটা কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়।

● প্রসবের পরে ফুল পড়ে গেলে তারপর এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত, তা না হলে ফুল আটকে যেতে পারে।

● এ ওষুধ ব্যবহারের কয়েক দিনের মধ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা না দিলে রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠান উচিত।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

মেথারজিন	(সেন্ডোজ)
মেথারসপান	(অপসোনিন)

গর্ভের সময় বিশেষ করে প্রথম তিন মাস ওষুধ ব্যবহারে সাবধান, বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে। দুগ্ধবতী মায়ের বেলায়ও ওষুধ দিতে সাবধান; দুধে ওষুধ আসতে পারে।

ফেরাস সালফেট ফিউমারেট টেবলেট/সিরাপ

(ফেরাস সালফেট/ ও ফলিক এসিড টেবলেট/সিরাপ)

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–
(২০০–৬০০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন)
ক্যাপসুল ১টা করে দিনে ১–২ বার।
টেবলেট ১–২টা করে দিনে ১–৩ বার।

শিশুদের ক্ষেত্রে–
১–৫ বৎসরের নীচে ঃ ৫০-১০০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন
সিরাপ ১/২–১ চা চামচ করে ১–২ বার।

৬–১২ বৎসর ঃ২০০–৪০০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন
টেবলেট ১টা করে দিনে ১–৩বার
সিরাপ ১–২ চা চামচ করে ১-৩ বার।

কিভাবে পাওয়া যায়ঃ
বিভিন্ন মাত্রার টেবলেট, ক্যাপসুল ও সিরাপ।

● রক্তশূন্যতার পরিমাণের উপর নির্ভর করে এ ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। বাজারে বিভিন্ন মাত্রার এ ওষুধ পাওয়া যায়। তারই একটি সুবিধাজনক ব্যবহারবিধি এখানে দেয়া হল। ব্যবহারের পূর্বে ওষুধের গায়ে লেখা পরিমাণ দেখে এর মাত্রা ঠিক করে নেয়া উচিত।

● ফলিক এসিড সংমিশ্রণে প্রস্তুত বাজারজাত ওষুধে আনুপাতিক হারে ফলিক এসিড মেশানো থাকে।

ব্যবহারের নিয়ম·

এদেশের গ্রামের কিংবা বস্তি এলাকার বেশীর ভাগ লোকই কম বেশী রক্ত শূন্যতায় ভুগে। এই রক্তশূন্যতার প্রধান কারণ হচ্ছে শরীরে আয়রন বা লৌহের অভাব, রক্ত কণিকার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে এই আয়রন। শরীরে প্রতিনিয়ত রক্ত কণিকা তৈরী হচ্ছে প্রয়োজন অনুপাতে। কোন কারণে শরীর থেকে রক্তরক্ষণ হলে বা রক্ত বের হয়ে যায় এ রকম রোগ হলে বর্ধিত হারে রক্তকণিকা তৈরীর প্রয়োজন পড়ে। ফলে শীঘ্রই শরীরের জমা আয়রন নিঃশেষ হয়ে গিয়ে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

পর্যাপ্ত খাবার-দাবার গ্রহণ করলে শরীরে আয়রনের অভাব হয় না। কিন্তু এদেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠী অপুষ্টির শিকার। তাই পুষ্টিহীনতায় আক্রান্তরাও রক্তশূন্যতায় ভুগে। এছাড়া গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মেয়েদের আয়রনের প্রয়োজন অন্যদের চেয়ে বেশী। গর্ভধারণের স্বাভাবিক সময় কাল শেষ হওয়ার পূর্বে জন্ম হওয়া শিশুদের আয়রনের অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে।

আয়রনের অভাবের প্রধান কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত প্রধান কারণসমূহ পাওয়া যায়।

১. পুষ্টিহীনতা–এটা হতে পারে পর্যাপ্ত খাবারের অভাবে অথবা কৃমি বা অন্যান্য পেটের পীড়া যেমন ডায়রিয়া।

২. অতিরিক্ত রক্তক্ষয়–প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষয়, অতিরিক্ত স্রাব, পাকস্থলীর ঘা, অর্শ ও বিভিন্ন প্রকার ক্যানসার প্রভৃতি কারণে।

৩. বাড়তি প্রয়োজন–গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা, গর্ভে স্বাভাবিক সময়কালের পূর্বে জন্ম হওয়া শিশুরও প্রয়োজন বেশী।

রক্তশূন্যতার লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে ক্লান্তি, অবসন্নতা, হাত, পা, ঠোঁট ও মুখমন্ডলের ফ্যাকাশে ভাব, পরিশ্রম করলে বুক ধড়ফড় করা, এমনকি দম আটকে আসা। জিহবা মসৃণ, ফ্যাকাশে হওয়া। কারও কারও খাবার গিলতে গেলে গলায় আটকে যায়, চোখের নীচের পাতার ভিতরের স্বাভাবিক লালভাব ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নখের স্বাভাবিক আকার ও মসৃণতা নষ্ট হয়ে গিয়ে ক্রমান্বয়ে পাতলা, অমসৃণ, চেপ্টা, এমনকি গর্তও হতে পারে।

আয়রনের অভাব ছাড়াও রক্তশূন্যতার আরও কারণ রয়েছে। রক্তহীনতার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ আয়রন দেওয়ার পরও যদি অবস্থার উন্নতি না হয়, উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে কারণ খুঁজে বের করতে হবে। এ সমস্ত রুগীর রক্তহীনতা অন্য কারণে হতে পারে যেগুলো না শুধরালে রক্তশূন্যতা থেকে যাবে।

বিপদ ও সতর্কতা

- এটি নিরাপদে ব্যবহার করা যায় তবে যাদের পর্যাপ্ত আয়রন দেবার পর অবস্থার উন্নতি হয়নি তাদের ক্ষেত্রে দেরি না করে আসল কারণ বের করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে।

- গর্ভবতী মা, অনেকদিনের পুরানো ডায়রিয়া কিংবা বদহজমী, পাকস্থলীর অপারেশন, মৃগীরোগের ওষুধ ব্যবহার, প্রভৃতিতে আয়রন ছাড়াও ফলিক এসিডের ঘাটতি হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আয়রনের সাথে ফলিক এসিড সংযুক্ত করলে সুফল পাওয়া যায়।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

আইরনা	(জনসেবা)	ফিওফল	(এসকেএফ)
ফেরোম্যাট	(ফার্মাদেশ)	ফিক্যাপ	(রেনাটা)
ফলফিটেব	(ফাইসন্স)	ফেরোলিন	(ওরিয়ন)
সিনাফেরন	(ইবনে সিনা)	ফেরোফল	(সিপলা)
আইরোফল	(জেনারেল)	ফেরোসিট	(একমি)
ফেরোসিন	(জেসন)	এরিসটোফেরন	(বেক্সিমকো)
ফেরোস্পান	(ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল)		

মা বাবার ধূমপান
ছেলে মেয়ের বিষপান

ভিটামিন এ ক্যাপসুল

ব্যবহারের মাত্রা

চোখ যাদের আক্রান্ত হয়েছে তাদের

১টি ক্যাপসুল প্রথমদিন, ১টি পরের দিন এবং আরেকটি এক সপ্তাহ পর।

পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত বা অনেক দিনের পুরানো ডায়রিয়ায় আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ৬ মাসে একটি করে ক্যাপসুল দিতে হবে।

কিভাবে পাওয়া যায়–

ক্যাপসুল ২ লক্ষ ইউনিটের প্রতিটি

এই ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়। এদেশের শিশুরা বিশেষ করে এর শিকার।

শাকসবজি যেমন কচুশাক, লালশাক, পালংশাক, গাজর, মিষ্টি আলু, বাঁধাকপি ও অন্যান্য তরিতরকারী, ফলমূল যেমনঃ আম, কাঠাল, পেঁপে, কলা ইত্যাদি, দুধ ডিম, মাংস, কলিজা, মাখন, ঘি, ছানা, পনির ও অন্যান্য দুগ্ধজাত খাবার, মাছের তেল ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন 'এ' রয়েছে। এসব খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণ খেলে এই ভিটামিনের অভাব হয় না। কিন্তু দরিদ্র জনগণের অনেকের ভাগ্যেই এসব খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণ জুটে না।

এদেশের শিশুরা প্রায়ই ডায়রিয়া ও অন্যান্য পেটের পীড়ায় ভোগে বলে যে খাদ্য তারা খায় তার বিরাট অংশ শরীরের কাজে লাগাতে পারে না।

- শিশুকে শাকসবজি না খাইয়ে অনেকে শুধু আটা, চালের গুড়া ও বার্লি খাওয়ান ফলে পুষ্টিহীনতা ও রক্তশূন্যতার সাথে সাথে দেখা দেয় ভিটামিনের অভাব, যার মধ্যে ভিটামিন 'এ' প্রধান।
- চোখের অপেক্ষাকৃত শুকনাভাব রাতকানা হওয়া এই ভিটামিনের অভাবের প্রাথমিক লক্ষণ। রুগীরা দিনে চোখে দেখলেও রাতে দেখে না। শিশুরা বলতে পারে না, তবে তাদের মায়েরা বলে শিশু দিনের বেলায় ঠিকমত চলাফেরা, খেলাধূলা করে কিন্তু রাত হলেই হোঁচট খায়, কান্নাকাটি করে, খেলাধূলা করতে পারে না।

● এর পরবর্তী পর্যায়ে চোখের সাদা অংশে ধূসর বর্ণের ছাপ দেখা যায় এবং তারপর হয় চোখের মণিতে ঘা। চোখের মণিতে ঘায়ের লক্ষণ হচ্ছে চোখ লাল হয়, ব্যথা করে, রুগী চোখে আলো সহ্য করতে পারে না এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ে। পরবর্তীতে এমনকি মণিতে ছিদ্র হতে পারে বা চোখের মণি নরম হয়ে সামনে বেরিয়ে পড়তে পারে। চোখের মণি সাদা হয়ে গিয়ে রুগী অন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই সময় থাকতে এই ভিটামিনের অভাব পূরণ করলে অন্ধত্বের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করা যায়।

● চোখের রোগ ছাড়াও 'এ' ভিটামিনের অভাবে চামড়া স্বাভাবিক মসৃণতা নষ্ট হয়ে গিয়ে খসখসে, অনেকটা ব্যাঙের চামড়ার মত হয়ে যায়।

● উপরোক্ত রুগী ছাড়াও যেসব শিশু পুষ্টিহীনতা, অনেক দিনের ডায়রিয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত, যে সমস্ত এলাকায় রাতকানা রোগের প্রকোপ বেশী, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিরোধ হিসাবে ভিটামিন 'এ' দিতে হবে।

এসব রোগের চিকিৎসার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে জনগণকে বুঝিয়ে বলা যে, কি কি খাবার খেলে এসব রোগ হয় না।

বিপদ ও সতর্কতা

● ভিটামিন 'এ' মাত্রাতিরিক্ত খেলে ক্ষতি হতে পারে।

বাজারজাত এ ওষুধের নাম

রেটিনল ফোর্ট ৫,০০০ ইউনিট	(ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল)
ওভিট-এ	(অপসোনিন)

ভিটামিন 'এ'র অভাবে আমাদের অনেক ছেলেমেয়ে দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। সময়মত ব্যবস্থা নিন। এর প্রতিরোধ করুন।

ক্লোরামফেনিকল চোখের ও কানের ড্রপ/মলম

ব্যবহারের মাত্রা

চোখের জন্য

ড্রপ–১-২ ফোঁটা ৩–৬ ঘন্টা পর পর চোখে

মলম–৩–৬ ঘন্টা পর পর প্রতি চোখে

ড্রপ বা ফোঁটা দিনের বেলায় এবং মলম রাত্রি বেলায় সাধারণতঃ ব্যবহার করা উচিত। সংক্রমণের মাত্রা বেশী হলে আরও ঘন ঘন ব্যবহার করা যেতে পারে। ওষুধের মাত্রা সব বয়সের জন্য সমান।

চোখ স্বাভাবিক হওয়ার পরও ২-৩দিন ব্যবহার করার পর এ ওষুধ বন্ধ করা উচিত।

কানের জন্য

ড্রপ–৩-৪ ফোঁটা দিনে ৩–৪ বার।

মলম–২-৩ বার প্রত্যেক দিন লাগাতে হবে।

লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণভাবে চলে যাবার ২–৩ দিন পর এ ওষুধ বন্ধ করতে হবে।

কিভাবে পাওয়া যায় –

চোখের জন্য–

ড্রপ–০.৫% ক্লোরামফেনিকল

মলম–১% ক্লোরামফেনিকল

কানের জন্য–

ড্রপ–০.৫% ক্লোরামফেনিকল

মলম–১০% ক্লোরামফেনিকল

ব্যবহারের বিবরণ

চোখের ও কানের বেশীর ভাগ সংক্রমণে এ ওষুধ কার্যকরী। চোখ উঠা এদেশের সকলের কাছে অতি পরিচিত রোগ। এ রোগে চোখ লাল, চোখ জ্বালা, চোখ থেকে পানি বা পুঁজ পড়া ইত্যাদি হয়ে থাকে যাকে কনজাংটিভাইটিস বলে। অনেক কনজাংটিভাইটিস এ ওষুধে ভাল হয়ে যায়। তাই এ রোগে ক্লোরামফেনিকল ড্রপ ও মলম ব্যবহার করা হয়।

চোখ লাল হওয়া ছাড়াও চোখে অত্যধিক ব্যথা, চোখে আলো সহ্য না হওয়া (আলোর দিকে তাকালে চোখে ব্যথা বাড়ে), চোখ দিয়ে পানি বা পুঁজ পড়া মাথা ব্যথা ইত্যাদি চোখের মণিতে ঘা হওয়ার লক্ষণ।

এই ঘায়ের অন্যতম প্রধান কারণ সমূহের মধ্যে রয়েছে চোখে আঘাত (ধান, ইটের কণা, বালি ইত্যাদি চোখে পড়লে বা কোন জিনিস দ্বারা খোঁচা লাগলে)

ভিটামিন 'এ' এর অভাব এবং কনজাংটিভাইটিস চোখের ঘায়ে এ মলম কার্যকরী।

সুতরাং এ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে চোখ পরিষ্কার তুলা বা নরম কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। তবে এ চিকিৎসা অসম্পূর্ণ, তাই এ চিকিৎসা দেবার পর রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে।

- চোখে আঘাত পেলে (বিশেষ করে মণিতে) যাতে চোখে ঘা না হয় সে জন্য প্রতিরোধক হিসাবে এই ড্রপ বা মলম ব্যবহার করা যেতে পারে। চোখের কোণায় ফুলে গিয়ে অনেক সময় চোখ দিয়ে পুঁজ পড়তে দেখা যায় এ রোগেও এ ওষুধ দেওয়া যায়।

নানা ধরণের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে কানে প্রদাহ হতে পারে। কানে প্রদাহ সন্দেহ করলে উজ্জ্বল আলোতে কানের ভেতরটা ভাল করে দেখা উচিত। কানের ভেতর দেখা যাবে লাল হয়ে গেছে। কানে ব্যথাও থাকে। কানের সংক্রমণজনিত এ প্রদাহে এ ওষুধের ফোঁটা বা মলম ব্যবহার করা উচিত।

কান পাকা এদেশের একটি পরিচিত রোগ। এসব রুগীর প্রায়ই কান থেকে পুঁজ পড়ে, রুগী কানে কম শুনে। উপযুক্ত সময়ে (যখন কানে ব্যথা ও জ্বর থাকে, পুঁজ পড়ে না) এন্টিবায়োটিকের সাহায্যে সংক্রমণের চিকিৎসা না করার ফলে পর্দা ফেটে এই পুঁজ বের হয়ে আসে। এসব রুগীর কান শুকনা তুলা দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত

এবং রুগীর কানে যাতে পানি না যায় সে পরামর্শ দেয়া উচিত (যেমন পুকুরে ডুব দিতে নিষেধ করা)।

কান পাকা রোগে (কানের পর্দা ছিদ্র থাকলে) এ ওষুধ দেয়া উচিত নয়।

বিপদ ও সতর্কতা ঃ

- এ ওষুধ ব্যবহারের ২–৪ দিনের মধ্যে উন্নতির লক্ষণ দেখা না দিলে রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো উচিত।
- এ ওষুধ সম্পূর্ণ নিরাপদ হলেও এর এলোপাথারি এবং অনিয়মিত ব্যবহার ক্ষতিকর।
- দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ায় বা চোখের ছানি পড়ায় এর কোন উপকারিতা নেই।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

ক্লোরাম	(ইবনে সিনা)
এ-ফেনিকল	(একমি)
ক্লোরামেক্স	(রেনাটা)

চোখ উঠা ছোঁয়াচে। পরিষ্কার কাপড় বা রুমাল ব্যবহার করুন। চোখ ঘষবেন না। যা'তা ওষুধ চোখে দেবেন না। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড টেবলেট/লিকুইড অথবা এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়াম ট্রাইসিলিকেট টেবলেট/লিকুইড

ব্যবহারের মাত্রা

টেবলেট–১-২টা দিনে ৩–৪বার খাবারের ১ ঘন্টা পর
লিকুইড–১-২চামচ (চা চামচ) দিনে ৩-৪ বার। খাবারের ১ ঘন্টা পর।
রাত্রে শোবার সময় প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত একটি মাত্রা ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিভাবে পাওয়া যায়–
টেবলেট
লিকুইড

ব্যবহারের বিবরণ

যে সমস্ত রোগে এ সব ওষুধ ব্যবহার করা যায় তার মধ্যে পেপটিক আলসার বা পাকস্থলীর ক্ষত (ঘা) প্রধান। এ রোগে পেটের উপরিভাগে ব্যথা হয়। সাধারণতঃ খালিপেটে ব্যথা বাড়ে।

কেউ কেউ শেষরাত্রে পেটে ব্যথা অনুভব করেন এবং কারও কারও ব্যথার জন্য ঘুম ভেঙ্গে যায়।

পানি, দুধ, সোডা বা অন্যকিছু খেলে এ ব্যথা সাধারণতঃ উপশম হয়।

কোন কোন রোগীর টক ঢেকুর উঠে, আবার কারও কারও বমি, রক্তবমি বা আলকাতরার মত কালো (সাধারণত নরম) পায়খানা হয়।

উপরোক্ত লক্ষণ ছাড়াও পেটের ঘা, বিশেষ করে পাকস্থলীর প্রদাহের লক্ষণ পেটফাঁপা হিসাবে প্রকাশ পেতে পারে। তবে এ পেট ফাঁপার অনেক কারণ রয়েছে।

বিশেষ করে যাদের বয়স ৪০ এর উপর, অজানা কোন কারণে (খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম বাদ দিয়ে) অতি অল্প সময়ের মধ্যে যদি পেটফাঁপা দেখা দেয় এবং এ ওষুধ দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে উন্নতি না হলে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

কতগুলো ক্ষেত্রে রুগী পেটের উপরিভাগে ব্যথা বা জ্বালার কথা বলে, গা ঝুকলে, যেমন নামাজের সিজদার সময় বা ভরাপেটে বিছানায় শুয়ে পড়লে বাড়ে এবং বসা বা দাঁড়ান অবস্থায় কমে। এটা 'হায়াটাস হার্নিয়া' ও 'গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স' (অর্থাৎ পাকস্থলীর অম্লরস খাদ্যনালীতে নিক্ষিপ্ত হওয়া) এর কারণে হয়ে থাকে। এরকম রুগীকে এ ওষুধ দেয়া যেতে পারে।

● সময়মত আহার গ্রহণ উপরোক্ত রোগগুলোর নিরাময়ের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। ঘন ঘন অল্প আহারের প্রয়োজন নেই।

● রুগীকে ধূমপান বর্জন ও মানসিক দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ পরিহার করার পরামর্শ দিতে হবে।

● এ ওষুধ খাবারের প্রায় ঘন্টাখানেক পরে খাওয়া উচিত। তা না হলে সম্পূর্ণ উপকারিতা পাওয়া যায় না।

বিপদ ও সতর্কতা

এ ওষুধ নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাদের বেলায় এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড না দিয়ে ম্যাগনেসিয়ামের সংমিশ্রণে তৈরী ওষুধ দেয়া উচিত।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

ওক্সিকোন	(একমি)	জেপিড্রক্স	(জেসন)
নিউট্রালন	(জনসেবা)	স্টোমা	(এসকেএফ)
জেনাসিড	(জেনারেল)	এ্যাভলোসিড	(এসিআই)
ফার্মাসিড	(ফার্মাদেশ)	এলমাজেল	(সিপলা)
ল্যাকটামিল	(বেক্সিমকো)	জেলুড্রক্স	(ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল)
এনসিড প্লাস	(রেনাটা)	গ্যাসট্রোডাইন	(ওরিয়ন)

রেনিটিডিন টেবলেট

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে ঃ

১৫০ মিলিগ্রামের টেবলেট দিনে ২ বার

অথবা ৩০০ মিলিগ্রামের টেবলেট দিনে ১ বার রাত্রে ৬-৮ সপ্তাহ

শিশুদের ক্ষেত্রে ঃ

১০ বৎসরের নীচে ঃ ১৫০ মিলিগ্রামের টেবলেট রাতে ১টি

১০-১২ বৎসর ঃ দিনে ২টি।

কিভাবে পাওয়া যায় ঃ

১৫০ এবং ৩০০ মিলিগ্রাম টেবলেট

ব্যবহারের নিয়ম ঃ

এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড,

এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ও মেগনিসিয়াম ট্রাইসিলিকেট দেখুন (পৃষ্ঠা ৬৮)

বিপদ ও সর্তকতা ঃ

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নগণ্য।

দুর্বলতা, মাথা ঘুড়ানো এবং গায়ে কিছু দানা দেখা দিতে পারে। কদাচিত পুরুষদের দুগ্ধ ফুলে যেতে পারে। এতে ভয়ের কোন কারণ নেই।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

রেনিডিন	(একমি)	পেপটিল-এইচ	(এস্কেএফ)
নরমা-এইচ	(রেনেটা)	নিউসেপটিন আর	(বেক্সিমকো)
রেনিট	(ফার্মাদেশ)	জেনটাক	(গ্লাক্সো-ওয়েলকাম)
রেনিটিড	(অপসোনিন)	ইনসিয়াক	(ইবনে সিনা)
নিওটিডিন	(সিপলা)	জেপিন	(জেনারেল)
ওরট্যাক	(ওরিয়ন)	এসিনার	(ফাইসন্স)
রেনিসন	(জেসন)	জ্যানটিড	(এ সি আই)
আলকার	(ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল)		

ওমিপ্রাজল ট্যাবলেট

ব্যবহারের মাত্রা ঃ

২০ মিলিগ্রামের দিনে ২ বার ৪-৮ সপ্তাহ
পরবর্তীতে ২০ মিলিগ্রাম দিনে ১ বার

ব্যবহারের বিবরণ ঃ

পাকস্থলীর ঘা (আলসার), পেটের উপরিভাগে জ্বালা/ব্যাথা, খালি পেটে বা রাতে শোবার পর ব্যথা হয়ে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া, খাওয়ার পর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লে বুকে ব্যথা এবং মুখে পানি আসা বা টক ঢেকুর উঠা ও বমি হওয়া, পাকস্থলীর অম্লরস খাদ্য নালীতে নিক্ষিপ্ত হওয়া (হায়টাস হার্নিয়া) এরকম রুগীকে এ ওষুধ দেয়া যেতে পারে।

কিভাবে পাওয়া যায় ঃ

২০ এবং ৪০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট /ক্যাপসুল

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঃ-

বমি, জ্বর, কোষ্ঠ-কাঠিণ্য
পেটে ব্যাথা, মাংসে ও গিরায় ব্যাথা, চোখে
ঝাপসা দেখা, চুলকানি ইত্যাদি।

কয়েকটি বাজারজাত ওষুধের নাম

ওমেটিড	(অপসোনিন)
প্রোসেপটিন	(বেক্সিমকো)
প্রোবিটর	(নোভারটিস)
জেলড্রিন	(এ সি আই)

হায়োসিন এন বিউটাইল ব্রোমাইড টেবলেট/ইন

ব্যবহারের মাত্রা

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–
টেবলেট ১-২টা দিনে ৩-৪ বার অর্থাৎ আট বা ছয় ঘন্টা পর পর।
ইনজেকশন ১-৩ এম্পুল মাংসে বা শিরায় ছয় থেকে আট ঘন্টা পর পর।

শিশুদের ক্ষেত্রে–
৬-১২ বৎসর ঃ
টেবলেট ১/২–১টা দিনে ৩–৪ বার
ইনজেকশন ১/২–১ এম্পুল মাংসে বা শিরায় ছয় থেকে আট ঘন্টা পর পর।

৬ বছরের নীচে শিশুদের এ ওষুধ দেওয়া নিষেধ। ব্যথা কমে গেলে এ ওষুধ বন্ধ করে দিতে হবে।

কিভাবে পাওয়া যায়–
টেবলেট-১০ মিলিগ্রামের প্রতিটি
ইনজেকশন-২০ মিলিগ্রামের প্রতি এম্পুল

ব্যবহারের বিবরণ

এটি ব্যথা উপশমের ওষুধ। নানা কারণে পেটে ব্যথা হতে পারে। রোগ নির্ণয় ও তার উপযুক্ত চিকিৎসা করাই হচ্ছে পেটে ব্যথার আসল চিকিৎসা। তবে রোগ নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত রুগীর ব্যথা উপশমের জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। পাকস্থলীর ঘা, পিত্তথলী বা পিত্তনালীর ব্যথা, বৃক্ক বা কিডনী বা মূত্রনালীর ব্যথা, অন্ত্রের ব্যথা ও তলপেটের অন্যান্য ব্যথার উপশমে সাময়িকভাবে এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাকস্থলীর ঘায়ের লক্ষণাদি আগেই বলা হয়েছে। পিত্তথলীর ব্যথার লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে উপর পেটের ডানদিকের ব্যথা, সঙ্গে জ্বর ও বমি হতে পারে। উপর পেটের ডানদিকে চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হয়। এমনকি পেটের এ অংশ শক্ত হয়ে যেতে পারে। কারও কারও চোখ হলুদ হতে পারে।

কিডনী বা বৃক্কের ব্যথার লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে পেটের ডানপাশের, বামপাশের বা উভয়পাশের মাঝামাঝি জায়গায় ব্যথা করা। এ ব্যথা কখনও কখনও উপরোক্ত স্থানে শুরু হয়ে নিচের দিকে নামতে পারে। প্রস্রাবের রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারে। পেটের উক্ত অংশে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, এমনকি জ্বরও হতে পারে।

বিপদ ও সতর্কতা

- কারও যদি ব্যথার সাথে প্রস্রাব আটকে যায় বা ব্যথার আগে থেকেই প্রস্রাব বা পায়খানা আটকে যাবার কথা রুগী যদি বলে, তাদের বেলায় এ ওষুধ দেওয়া নিরাপদ নয়।
- ব্যথার মাত্রার উপর নির্ভর করে এ ওষুধ টেবলেট বা তীব্র ব্যথার দ্রুত নিরাময়ের জন্য ইনজেকশন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- মাথা ব্যথা, গা-হাত-পায়ের ব্যথায় এ ওষুধ মোটেও কার্যকরী নয়। উপরোক্ত পেটে বিভিন্ন ব্যথা কোন কোন সময় বুকেও যেতে পারে।
- এ ছাড়া বাদবাকী বুকের ব্যথায়, যা সাধারণতঃ হৃদপিণ্ড বা ফুসফুসের কারণে হয়ে থাকে, এ ওষুধ মোটেও কার্যকরী নয়।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

বিউটাপেন টেবলেট	(ফাইসন্স)	ডিসপা	(সিপলা)
হাইসোমাইড টেবলেট	(অপসোনিন)	স্পাজমোসন	(জেসন)
হাইসোসিন	(ফার্মাদেশ)		
স্পানিল	(বেক্সিমকো)		

ডায়াজিপাম টেবলেট/ইনজেকশন

ব্যবহারের মাত্রা

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রাতে ঘুমানোর আগে দেয়া হয়। তবে প্রয়োজনে দিনের যে কোন সময় দেয়া যেতে পারে।

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

টেবলেট ১–২ টা (প্রয়োজন অনুযায়ী) ২–৫ (মিলিগ্রামের) ৬–৮ ঘন্টা পর পর।

ইনজেকশন ১ এম্পুল মাংসে বা শিরায় ৬–৮ ঘন্টা পর পর প্রয়োজন অনুসারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

১ বৎসরের নীচে

টেবলেট বা ইনজেকশন পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার আট ভাগের এক ভাগ।

১–৫ বৎসর

টেবলেট বা ইনজেকশন পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার চার ভাগের এক ভাগ।

৬–১২ বৎসর

টেবলেট বা ইনজেকশন পূর্ণবয়স্কদের মাত্রার অর্ধেক

খিঁচুনি বা মারাত্মক অস্থিরতা হলে ইনজেকশন ব্যবহার করা উচিত। এসব ক্ষেত্রে উপরোক্ত মাত্রা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ান যেতে পারে।

কিভাবে পাওয়া যায়–

টেবলেট ২ বা ৫ মিলিগ্রামের একটি

ইনজেকশন ১০ মিলিগ্রামের প্রতিটি (মাংসে বা শিরায় ব্যবহারযোগ্য)

ব্যবহারের বিবরণ

এ ওষুধে ঘুম হয়। দুশ্চিন্তা কমে এবং খিঁচুনি বন্ধ হয়। যন্ত্রনাদায়ক যে কোন

অসুখে রুগীর ঘুম কম হয়, এমনকি একেবারেই না হতে পারে। রোগের সঠিক নির্ণয় ও তার উপযুক্ত চিকিৎসা করাই নিয়ম। তবে রুগীর যন্ত্রণা ও অস্থিরতা উপশম ও রুগীকে যথাসম্ভব যন্ত্রণামুক্ত রাখার জন্য এ ওষুধ সাময়িকভাবে প্রয়োগ করলে রুগী শান্তিতে ঘুমাতে পারে, দুশ্চিন্তা কমে।

পেটের, বুকের, গায়ের, হাতের ও মাথার তীব্র ব্যথায় এ ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

● অনেক রোগে খিঁচুনি হতে পারে। খিঁচুনি হলে এটা বন্ধ করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে এ ওষুধ ব্যবহার করা যায়। যতটুকু মাত্রা দিলে খিঁচুনি বন্ধ হয় ঠিক ততটুকু মাত্রা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

পরবর্তীতে সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্য রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো দরকার।

রক্তক্ষরণের রুগীকে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ কমিয়ে বিশ্রাম দেয়ার উদ্দেশ্যে ডায়াজিপাম ব্যবহার করা যেতে পারে, এতে রক্তক্ষরণ কমতে সহায়তা করে।

প্রয়োজন অনুসারে এ ওষুধ মৃগী বা খিঁচুনি, তীব্র ব্যথা, রক্তক্ষরণ প্রভৃতির মত জরুরী প্রয়োজনে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে ইনজেকশন রূপে ব্যবহার করা উচিত।

বিপদ ও সতর্কতা

● কোন অর্ধচেতন, অচেতন বা ঝিমুনি রুগীকে এ ওষুধ দেয়া উচিত নয়। মাথায় আঘাত পাওয়া রুগীকে ডায়াজিপাম দেয়া উচিত নয়। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারে রুগীর সংজ্ঞা আরও লোপ পায় এবং রুগীর প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ জটিলতর হয়ে উঠে।

● প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা এলোপাথারি ব্যবহার রুগীকে এ ওষুধের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। ফলে রুগী নিজেই ইচ্ছামত এ ওষুধ খেতে থাকে অর্থাৎ এ ওষুধের নেশা হয়ে যায়।

● শুধুমাত্র ঘুম না হওয়া যাদের সমস্যা, তাদের উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা সঠিক কারণ বের করে তার চিকিৎসা করা দরকার। এর উপশমের জন্য দিনের পর দিন এ ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়।

কয়েকটি বাজারজাত এ ওষুধের নাম

ফাইজেপাম টেবলেট	(ফাইসন্স)
ইজিয়াম টেবলেট	(অপসোনিন)
ফার্মাপাম	(ফার্মাদেশ)
সেডুলিন	(জেসন)

চরিত্রহীনতা যৌন ব্যধির মূল কারণ। চরিত্রবান লোকের সিফিলিস, গণোরিয়া, এইড্স্ ইত্যাদি হয় না। এইড্স্ নিরাময়ের কোন ওষুধ নাই। এ রোগ দেখা দিলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রতিরোধই একমাত্র হাতিয়ার।

ফ্রুসেমাইড টেবলেট/ইনজেকশন

ব্যবহারের মাত্রা

সাধারণতঃ সকাল বেলা এ ওষুধ খাওয়াতে হয়।

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

টেবলেট ১–২টা প্রতিদিন সকালে।

ইনজেকশন ১–২ এম্পুল শিরায় সকালে।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

টেবলেট ১/২–১টা প্রতিদিন সকালে।

ইনজেকশন ১ এম্পুল শিরায় সকালে।

প্রয়োজন বোধে মাত্রা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়াই শ্রেয়।

কিভাবে পাওয়া য়ায়–

টেবলেট ৪০ মিলিগ্রাম প্রতিটি

ইনজেকশন ২০ মিলিগ্রাম প্রতিটি

ব্যবহারের বিবরণ

নানা কারণে শরীরে পানি জমতে পারে (শোত)। শরীরে অতিরিক্ত পানি জমলে পা, মুখ, পেট, হাত ইত্যাদি ফুলে যায়। এই ফুলা জায়গা আঙ্গুল দিয়ে চাপদিলে বসে যায়। প্রস্রাবের পরিমাণ সাধারণতঃ কম হয় উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা এর সঠিক কারণ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা প্রয়োজন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় পুষ্টিহীনতার জন্য পা ফুলতে দেখা যায়। পুষ্টির অভাব পূরণ করলেই এটা ভাল হয়ে যায়।

● আমরা যে পরিমাণ পানি পান করি সে অনুপাতে প্রস্রাব না হলে শরীরে পানি জমে। তাই প্রস্রাবের পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রস্রাব কমে গেলে বা

একেবারেই না হলে দেখতে হবে রুগীর প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে কিনা বা মূত্রথলিতে প্রস্রাব জমে তলপেট ফুলে যাচ্ছে কিনা। হলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু স্বাভাবিক পরিমাণ পানি খাওয়া হচ্ছে, বমি বা পাতলা পায়খানা আকারে শরীর থেকে বের হচ্ছে না, তলপেটে পস্রাব জমছে না কিন্তু প্রস্রাবের পরিমাণ কমে গেছে বা বন্ধ হয়ে গেছে দেখলে এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ওষুধ প্রস্রাব আকারে শরীর থেকে পানি বের করে দেয়। ফলে ফুলা কমে যায়। যাদের শরীরে অতিরিক্ত পানি জমে ফুলা দেখা দেয় তাদের এ ওষুধ দেয়া যায়।

কতগুলি কারণে ফুসফুসেও পানি জমতে পারে তখন শ্বাসকষ্ট হয়, এ শ্বাসকষ্ট বিশেষ করে শুয়ে থাকলে এবং রাত্রিবেলায় বেশী হয়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়ার পর যদি প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়, কিংবা দুটো একসাথে হয়, তাহলে ফ্রুসেমাইড দেয়া যেতে পারে। শ্বাসকষ্টের সাথে কিংবা পরে শরীরে পানি জমলে বা ফুলা দেখা দিলে এ ওষুধ ব্যবহার করা যায়। শ্বাসকষ্ট এবং পা ফুলা সাধারণতঃ হৃদপিণ্ডের রোগ থেকে উৎপন্ন হয়।

অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে পানি জমে পেটফুলা ও পরে পায়ে ফুলা যদি দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট তেমন থাকে না, তবে পেটের শিরাগুলো দেখা যায় এবং কারো কারো পেটের বামপাশের উপরিভাগে চাকার মত অনুভব হয়।

কেউ কেউ অতীতে রক্তবমি হওয়ার কথা বললে এটা সিরোসিস হবার সম্ভাবনাই বেশী। এ-রোগে ফুলার সাময়িক উপশমের জন্য এ ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিপদ ও সতর্কতা

- প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা ভুল প্রয়োগে বিপজ্জনক হতে পারে । তাই এ ওষুধ প্রয়োগে উন্নতির লক্ষণ দেখা না দিলে এটা বন্ধ করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে চিকিৎসায় সামান্য ভুলের জন্য এ সমস্ত রোগে বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে বলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো উচিত। ইনজেকশনের তুলনায় এ ওষুধের টেবলেট অনেক নিরাপদ বলে টেবলেটই সচরাচর ব্যবহার করা উচিত। কেবলমাত্র ফুসফুসে পানি জমে শ্বাসকষ্ট হলে বা প্রস্রাব

একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলে এ ওষুধের ইনজেকশন ব্যবহার করা উচিত। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া উচিত।

● এ ওষুধ ব্যবহারে শরীরে পটাশিয়ামের ঘাটতি হতে পারে, ডাবের পানি, কলা, আনারস, ফল ইত্যাদি খাওয়ালে আলাদা পটাশিয়াম দিতে হয় না।

বাজারজাত এ ওষুধের নামঃ

ফুরুসিন	(অপসোনিন)
ল্যাসিক্স	(হোয়েক্স্ট)

অযথা ওষুধ খাবেন না, চিকিৎসকের কাছে ওষুধ চেয়ে নেবেন না।
ওষুধেও অসুখ হতে পারে।

গ্লুকোজ ইলেকট্রোলাইট পাউডার
(ও.আর. এস.)

ব্যবহারের মাত্রা

বমি বা পায়খানা পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশী। যতবার বমি বা পায়খানা ততবার সমপরিমাণে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

কিভাবে পাওয়া যায়

গুড়া অবস্থায় প্যাকেটে পাওয়া যায়। প্রতি প্যাকেট এক সের পানিতে গুলতে হয়।

ব্যবহারের বিবরণ

ডায়রিয়া বা আমাশয় রোগে প্রতিদিন এদেশে অগণিত মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা আক্রান্ত হয় এবং বিনা চিকিৎসায় প্রচুর মৃত্যু ঘটে। সময় থাকতে চিকিৎসা করলে প্রায় সব রুগীকেই বাঁচানো যায়। গ্লুকোজ ইলেকট্রোলাইট পাউডার হল এ রোগের মহৌষধ।

ঘন ঘন পাতলা পায়খানা যে কারণেই হউক না কেন তাকে আমরা ডায়রিয়া বা উদরাময় বলে থাকি, নানা কারণে ডায়রিয়া হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে ভাইরাস, কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য কয়েক ধরণের জীবাণু। এমনকি জীবাণুজনিত কারণ ছাড়াও ডায়রিয়া হতে পারে।

অনেকক্ষেত্রে আবার অতিরিক্ত পায়খানার সাথে সাথে ঘন ঘন বমি হতে থাকে। অত্যধিক হারে শরীর থেকে পানি বা অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান বের হয়ে যায় বলেই এ রোগে মৃত্যু ঘটে; তাই সময়মত এ সমস্ত ঘাটতি পূরণ করাই এ রোগের প্রধান চিকিৎসা।

লবণ, গুড় ও পানি আনুপাতিক হারে মিশিয়ে ঘরে বসেই আমরা যে খাবার স্যালাইন বানাতে পারি কারখানায় ওষুধ আকারে তৈরী সেটার নাম গ্লুকোজ ইলেকট্রোলাইট পাউডার। এটা গুড়া আকারে বাজারে বিক্রি হয় যা পানিতে গুলে খাবার স্যালাইন তৈরী করে নিতে হয়।

ডায়রিয়া হলে করণীয়

ঘন ঘন পাতলা পায়খানা এমনকি চাল ধোয়া পানির মত পায়খানা, কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন কলেরা) ঘন ঘন বমি, শরীর নিস্তেজ ভাব, জিহবা শুকিয়ে যাওয়া, চামড়া ধরে ছেড়ে দিলে কুঁচকে থাকা, চোখ বসে যাওয়া, দ্রুত ক্ষীণ নাড়ীর স্পন্দন, কারও কারও পেটে, হাতে পায়ে ব্যথা ইত্যাদি ডায়রিয়ার লক্ষণ। এ রোগ প্রায়ই মহামারী আকারে দেখা দেয়, বিশেষ করে যেগুলি কলেরা সেগুলি রক্ত আমাশয়ের মত সংক্রামক।

পানি স্বল্পতার চিকিৎসাই ডায়রিয়ার চিকিৎসা

কম স্বল্পতা	**বেশী স্বল্পতা**
শিশু অস্থির ও খিটখিটে	**শিশু নিস্তেজ, সংজ্ঞাহীন এবং ঝিম খেতে যায়**
খুব পিপাসা পায়	**পানি পান করতে অসুবিধা কিংবা পারেনা**
চোখে পানি আসে না	**চোখ খুব বসে যায়**
ঠোঁট এবং জিহ্বা শুকিয়ে যায়	**চোখে কোন পানি থাকে না**
পেটের চামড়া চিমটি দিয়ে টানলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে য়ায়	**ঠোঁট ও জিহ্বা একেবারে শুকিযে যায়**
	পেটের চামড়া চিমটি দিয়ে টানলে খুব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়
চিকিৎসা ঃ খাবার স্যালাইন	**চিকিৎসা ঃ তৎক্ষণাৎ শিরায় স্যালাইন দেবার ব্যবস্থা।**

খাবার স্যালাইন বানানোর নিয়ম–

- **তিন আঙ্গুলের এক চিমটি লবণ (আঙ্গুলের প্রথম দাগ পর্যন্ত) এবং এক মুঠো গুড় আধাসের পানিতে গুলে এটা তৈরী করা যায়।**
- **গ্লুকোজ ইলেকট্রোলাইট পাউডার এর এক প্যাকেট এক সের পানিতে গুলতে হয়। পানি প্রথমে একটি পরিষ্কার পাত্রে ফুটিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করতে হয়। তারপর পরিমাণমত উক্ত পাউডার গুলে স্যালাইন তৈরী করতে হয়।**

এ স্যালাইন রুগীকে ঘন ঘন খাওয়ানো উচিত। যতবার পায়খানা বমি হবে তার সমপরিমাণ বা একটু বেশী স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

● লক্ষ্য রাখতে হবে রুগীর ঘাটতি পূরণ হচ্ছে কিনা। এ ঘাটতি পূরণ হলে রুগী সুস্থবোধ করবে, চোখ, চামড়া দেখতে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। নাড়ীর দ্রুত হার এবং ক্ষীণতা স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

ডায়রিয়া থামার পর পরবর্তী ২ সপ্তাহ রোজ শিশুকে একবার বাড়তি খাবার দিন। এতে শিশুর অপুষ্টি দূর হবে। ভিটামিন এ ক্যাপসুল ও দিতে হবে।

ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশুর উপযুক্ত খাবার ঃ

- ডালের পানি,
- চিড়া পানি,
- বুকের দুধ,
- ডাবের পানি,
- খিচুড়ি,
- নরম চটকানো আলুসিদ্ধ,
- ভাতের মাড়।
- ও আর এস, নিরাপদ খাবার পানি

বাচ্চার বমি হলে ৫-১০ মিনিট অপেক্ষা করুন তারপর প্রতি ২-৩ মিনিট পর পর চা চামচের ১ চামচ করে প্যাকেটের স্যালাইন বা লবণ গুড়ের শরবত আবার খাওয়ানো শুরু করুন।

ও আর এস,

আধা লিটার নিরাপদ পানিতে ১ প্যাকেট সবটুকু ও আর এস মেশাতে হবে। পানি কম হলে পাতলা পায়খানা বেড়ে যেতে পারে।

যদি শিশুর পায়খানার সাথে রক্ত থাকে তাহলে আমাশয় সন্দেহ করুন এবং চিকিৎসার জন্য পরামর্শ নিয়ে এন্টিবায়োটিক দিন।

বিভিন্ন মানের আই ভি স্যালাইন

ব্যবহারের মাত্রা

ব্যবহারের বিবরণে দেখুন

কিভাবে পাওয়া যায়ঃ

৫% ডেক্সট্রোজ ইন ওয়াটার ৫০০ বা ১০০০ সিসির ব্যাগ।

৫% ডেক্সট্রোজ ও ০.৯% স্যালাইন ৫০০ বা ১০০০ সিসির ব্যাগ।

নরমাল স্যালাইন (০.৯%) ৫০০ বা ১০০০ সিসির ব্যাগ।

ব্যবহারের বিবরণ

কোন কারণে শরীর থেকে দ্রুত হারে অত্যধিক পরিমাণ পানি বা রক্ত বের হয়ে শরীরের অবস্থা বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। এরকম অবস্থায় এ ঘাটতি অবিলম্বে পূরণ করা দরকার হয়ে পড়ে। আই, ভি স্যালাইন এ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ডায়রিয়া হলে সময়মত রুগীকে লবণ-গুড়ের সরবত খাওয়ালে প্রায় সব রুগীই সুস্থ হয়ে উঠে। তবে সময় মত লবণ গুড়ের শরবত বা গ্লুকোজ ইলেকট্রোলাইট পাউডার এর তৈরী স্যালাইন না খাওয়ালে রুগীর এমন অবনতি ঘটতে পারে যে মুখে খাওয়ার আর ক্ষমতা থাকে না। এসব ক্ষেত্রে রুগীর শিরায়এই স্যালাইন দিতে হয়।

● রুগীর মুখে খাওয়ার ক্ষমতা ফিরে আসলেই স্যালাইন ইনজেকশন বাদ দিয়ে রুগীকে মুখে লবণ গুড়ের শরবত দেয়া উচিত।

● কোন কোন রোগে ঘন ঘন বমি ও পেট ব্যথা হতে পারে,যে অবস্থায় রুগী মুখে খেতে পারে না বা মুখে খাওয়া নিরাপদ নয় সেক্ষেত্রে রুগীকে স্যালাইন ইনজেকশন দেয়া উচিত।

শরীরের কোথাও বড় ধরনের কেটে গেলে বা আঘাত পেলে সেখান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে পারে। এর মাত্রা যদি অত্যধিক হয় তাহলে রুগীর অবস্থার অবনতি ঘটে। মারাত্মক অবনতির লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে শরীর অবশ বা নিস্তেজ হয়ে

আসা, জিহবা শুকনা, অত্যধিক পিপাসা, চক্ষু কোঠরাগত, দ্রুত ক্ষীণ নাড়ীর স্পন্দন ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে রক্তক্ষরণের জায়গা ভালমত পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ গজ বা তুলা দিয়ে চেপে ব্যান্ডেজ করতে হবে যাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়, আর সেই সঙ্গে রুগীর শিরায় স্যালাইন ইনজেকশন দিতে হবে। রুগীর অবস্থার উন্নতি হলে স্যালাইন দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে। রুগীকে যথাশীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে।

এছাড়া কখনো প্রস্রাব পরবর্তী সময়ে, বড় ধরনের রক্তক্ষরণ হতে পারে। রক্ত বমি হলে বা পায়খানার সাথে রক্ত গেলে (যা ঘন আলকাতরার মত কাল পায়খানার আকারে দেখা দেয়) রক্তক্ষরণের ফলে শরীরের অবনতি ঘটলে উপরোক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায়। এক্ষেত্রে অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি রুগীকে স্যালাইন দেয়া উচিত।

মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ রুগীর পোড়া জায়গা থেকে অবিরাম রক্তের জলীয় অংশ বের হতে থাকে। এ ঘাটতি পূরণের জন্য এসব রুগীকে অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি স্যালাইন দেয়া উচিত।

কি হারে এবং কি পরিমাণে স্যালাইন দেয়া উচিত সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিমাণ রক্তক্ষরণ হয়েছে বা বমি কিংবা পায়খানার আকারে বের হয়ে ঘাটতি দেখা দিয়েছে তা একই হারে পূরণ করার নিয়ম। যেমন–

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে–

মিনিটে ৩০–৬০ ফোঁটা হবে, প্রয়োজন অনুসারে আরও দ্রুত হারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে–

৬–১২ বৎসর ঃ

মিনিটে ১৫-৩০ ফোঁটা হারে, প্রয়োজন অনুসারে আরও দ্রুত হারে।

৬ বৎসরের নীচে ঃ

মিনিটে ১০–২০ ফোঁটা হারে, প্রয়োজন অনুসারে আরও দ্রুত হারে।

মিনিটে যত ফোঁটা করে স্যালাইন দেয়া হবে, তত লিটার (১০০০ সিসি) ২৪ ঘন্টায় যাবে, (যেমন ২৪ ঘন্টায় ৪০০০ সিসি স্যালাইন দিতে হলে মিনিটে ৪০ ফোঁটা করে দেওয়া উচিত)।

● গুরুতর ক্ষেত্রে শুরুতে দ্রুত ও পরে ধীর গতিতে স্যালাইন দেয়া উচিত।

● শুধুমাত্র স্যালাইন বা ডেক্সট্রোজ এর সাথে মিশ্রিত স্যালাইন অতিরিক্ত দেয়া নিরাপদ বলে মোটামুটিভাবে অর্ধেক পরিমাণ ঘাটতি স্যালাইন ও বাদবাকী ৫% ডেক্সট্রোজ ইন ওয়াটার দিয়ে পূরণ করা উচিত।

লক্ষ্য রাখতে হবে, অতিরিক্ত স্যালাইন যেন না দেয়া হয়, ঘাটতি পূরণের লক্ষণসমূহের মধ্যে রয়েছে রুগীর তুলনামূলক সুস্থভাব, নাড়ীর দ্রুততা ও ক্ষীণভাব কমে আসা, জিহ্বা শুকনাভাব চলে যাওয়া ইত্যাদি। ঘাটতি পূরণ হলে রুগী মুখে খেতে সক্ষম হলে স্যালাইন দেয়া বন্ধ করা উচিত।

অতিরিক্ত স্যালাইন দিলে দ্রুতশ্বাস, এমন কি শ্বাসকষ্টও হতে পারে। অতিরিক্ত স্যালাইন রুগীর জন্য বিপজ্জনক।

মনে রাখতে হবে শুধু স্যালাইন দেয়া একমাত্র চিকিৎসা নয়। রোগ নির্ণয় ও তার উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য যথাশীঘ্র সম্ভব রুগীকে উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে পাঠাতে হবে।

কোন পশুপাখী তামাক পাতা খায় না

অল্প বয়সে বিবাহ

অল্প বয়সে বিবাহ হলে–

অধিক ছেলেমেয়ে হয়।

তাতে সব কিছুরই প্রয়োজন হয় অধিক পরিমাণে- যেমন ঃ

- শোবার জায়গা
- কাপড় চোপড় ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় যোগান দিতে না পারলে–

- শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগে।

স্বল্প জায়গায় অধিক লোক থাকার ফলে নানা রোগ বেড়ে যায় যেমন-

- চর্মরোগ,
- কৃমি,
- শ্বাসনালীতে সংক্রমণ ইত্যাদি।

এ সমস্ত কারণে শিশু মৃত্যুর হার বাড়ে।

বার বার প্রসবের কারণে মায়ের মৃত্যুর হারও বেড়ে যায়।

অতএব অল্প বয়সে বিবাহ করা ভাল নয়, সঙ্গতি না থাকলে পরিবারের লোকের সংখ্যা বাড়লে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অধিক ছেলেমেয়ে পুষ্টিহীনতা এবং নানা রোগের কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্যগত কারণে ছেলে মেয়ের সংখ্যা সীমিত রাখা প্রয়োজন।

কিভাবে এই উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়, তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক কিংবা স্বাস্থ্য কর্মীর পরামর্শ নিন।

টিকা

বেশ কয়েকটা রোগের পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। সময়মত টিকা দিলে এই সমস্ত রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। সরকারী কর্মসূচী অনুযায়ী বিনা খরচায় টিকাদানের ব্যবস্থা আছে। বিশেষ সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন টিকাদানের নিয়ম আছে। টিকার তালিকা এবং নিয়ম নিম্নে দেওয়া হল।

প্রতিষেধক টিকার তালিকা ও পদ্ধতি

টিকা দান বয়স ও পদ্ধতি

টিকার নাম	টিকাদানের বয়স	সর্বমোট ডোজের সংখা	ডোজের সংখ্যা অন্তবর্তী সময়	কোথায় দিতে হবে এবং কি পরিমাণ দিতে হবে।
ডি,পি,টি	১½ মাস-২ বৎসর	৩	১ মাস অন্তর অন্তর	০.৫ এম.এল.করে উরুদেশের নিম্নাংশে বর্হিভাগের মাংসের ভিতর।
পলিও	১½ মাস --২ বৎসর	৩	১ মাস অন্তর অন্তর	২-৩ ফোটাঁ খাওয়াতে হবে। ওষুধের ডোজ শিশির গায়ে লেখা থাকবে।
হাম	৯ মাস-২ বৎসর	১	X	.৫ এম.এল. করে উরুদেশের বর্হিভাগের চামড়ার নীচে।
বিসিজি	জন্ম থেকে ৫ বৎসর	১	X	০.৫ এম.এল. করে বাহুর উপরিভাগের মাংসের ভিতর।
টি,টি	গর্ভবতী মহিলা ধারণক্ষম ১৫-৪৫ বৎসর	২-৫ বৎসর পর পর বুষ্টারডোজ	এক মাস অন্তর	০.৫ এম. এল. করে বাহুর উপরিভাগের মাংসের ভিতর (এম.এল. মানে সিসি.)

একটি প্রতিষেধকের সূচীপত্রে থাকে ভ্যাকসিনগুলির নাম, প্রতিটি ভ্যাকসিনের প্রথম মাত্রার উপযোগী বয়স, প্রতিটি ভ্যাকসিনের মাত্রার সংখ্যা এবং প্রতিটি মাত্রার মধ্যবর্তী সময়। একটি শিশুর প্রতিষেধকের তালিকা তার প্রতিষেধকের কার্ডে উল্লেখ থাকে। একটি আদর্শ প্রতিষেধক তালিকা নিম্নরূপ ঃ –

শিশুর বয়স	*প্রতিষেধক*
১$\frac{১}{২}$ –৫ মাস	বি.সি.জি., ডি.পি.টি. -১ম মাত্রা পলিও–১ম মাত্রা
৬–৮ মাস	ডি.পি.টি.–২য় মাত্রা পলিও–৩য় মাত্রা
১–১১ মাস	ডি.পি.টি.–৩য় মাত্রা পলিও–৩য় মাত্রা মিজল্‌স্

ডি.পি.টি., পলিও, ডি.টি. ও টি.টি. যদি একটি শিশু দ্বিতীয় মাত্রা সময়মত না দিতে পারে এবং এক বৎসরের মধ্যে যদি টিকা নিতে না আসে তবে যথা নিয়মে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাত্রা দেওয়া উচিত। প্রথম থেকে আরম্ভ করা উচিত নয়।

ডি = ডিপথেরিয়া

পি = পারটুসিস বা হুপিং কফ অর্থাৎ লতাকাশ

টি = টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার

পলিও = পলিওমায়লাইটিস

বি সি জি = যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক

মিজল্‌স্ = হাম, লুতি

হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন

যাদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা

১। যারা ইনজেকসন দিয়ে মাদকদ্রব্য গ্রহণে আসক্ত
২। একাধিক অবৈধ যৌনমিলন
৩। হেপাটাইটিস বি রোগে আক্রান্ত মায়ের পেটের বাচ্চা
৪। অন্য রোগের কারণে যাদের প্রায় রক্ত গ্রহণ করতে হয়
৫। যারা দীর্ঘদিন কিডনী রোগে ভুগছেন
৬। স্বাস্থ্যকর্মী যারা রক্ত নিয়ে কাজ করে

ব্যবহারের মাত্রা

৩ ডোজ ১ মিঃ লিঃ করে ইনজেকশনের মাধ্যমে চামড়ার নীচে অথবা মাংসে
প্রথম ডোজের ১ মাস পর দ্বিতীয় ডোজ
প্রথম ডোজের ৬ মাস পর তৃতীয় ডোজ

কোথায় নিবেন

প্রাপ্তবয়স্কদের বেলায় বাহুতে উপরের ফোলা মাংশের (ডেল্টয়েড) শরীরের বাহিরের দিকের অংশে।
অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বেলায় উরুতে নিতে হবে।

কিভাবে বাজারে পাওয়া যায়

এনজারিক্স-বি (স্মিথ ক্লাইন বিচয়াম)

- বিমুজেন
- সবসময় একবার ব্যবহার যোগ্য সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ইনজেকশন নেবেন। নইলে জন্ডিস হবার বিপদ থাকে।

জলবসন্তের টিকা

এই টিকা ১২ মাস থেকে দেওয়া যায়

১২ মাস থেকে ১২ বৎসর ঃ- ১ ডোজ (০.৫ মিঃ লিঃ)

১৩ বৎসর থেকে উপরে ঃ- ২ ডোজ (০.৫ মিঃ লিঃ প্রতি ডোজ)

১ম ডোজের ৪-৮ সপ্তাহ পর ২য় ডোজ চামড়ার নিচে দিতে হবে।

সতর্কতা ঃ বেশী জ্বর বা অসুস্থ থাকলে দেয়া যাবে না, গর্ভবস্থায় দেয়া যাবে না। তৈরী করার পরপরই দিতে হবে।

বাজারজাত এ টিকার নাম ঃ

ভ্যারিলরিক্স (স্মিথ ক্লাইন বিচয়াম)

আমাদের কেহ পীড়িত হইলে রাসূল্লাহ্ (সাঃ) রোগীর দেহে হাত বুলাইয়া বলিতেন, 'হে মানব জাতির পালন কারী! এই বেদনা দূর কর ও সুস্থ করিয়া দাও; তুমিই স্বাস্থ্যদাতা, তুমি ছাড়া স্বাস্থ্য মেলে না, যে স্বাস্থ্য সকল রোগ হরণ করে ।

– রাসূলুল্লাহর বাণী

শিশুর শারীরিক বাড়তির হার

শিশু নিয়মিত বাড়ছে কিনা তা বুঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে শিশুর নিয়মিত ওজন নেওয়া। নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শিশুর ওজন নেয়া যেতে পারে।

প্রথম তিন মাস, প্রতি মাসে ওজন নেয়া উচিত, এরপর প্রতি তিনমাসে একবার করে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ওজন নিতে হবে। সম্ভব হলে ওজনের একটি হিসাব বানিয়ে রাখতে হবে।

ওজন ক্রমশঃ বাড়তে থাকলে তা ভাল লক্ষণ, একই রকম থাকলে খুব ভয়ের কিছু নেই, শিশুর খাবার দাবারের দিকে নজর রাখতে হবে, ওজন কমে যেতে থাকলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

● নিয়মিত ওজন নেয়া সম্ভব না হলে, শিশুর বৃদ্ধির গতি খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমন ঃ

শিশু হাসে	ঃ ১ মাস বয়সে
ঘাড় শক্ত করতে পারে	ঃ ৩ মাসে
কোন জিনিস হাতে ধরতে পারে	ঃ ৫ মাসে
দাঁত ওঠে	ঃ ৬ মাসে
বসতে পারে	ঃ ৭ মাসে
দাঁড়াতে পারে	ঃ ৯ মাসে
হামাগুড়ি দেয়	ঃ ১১ মাসে
দু-একটি অর্থপূর্ণ শব্দ বলে	ঃ ১২ মাসে
সাহায্য ছাড়াই হাঁটে	ঃ ১৩ মাসে
দুই তিন শব্দের কথা বলে	ঃ ২ বৎসরে
নিজে নিজে কাপড় পরে	ঃ ৩ বৎসরে

ক্যান্সার সম্পর্কে কিছু কথা

ক্যান্সারের বিপদ সংকেত

- খুসখুসে কাশি কিংবা গলাভাঙ্গা,
- স্তনে বা শরীরের অন্য কোথাও পিণ্ডের (দলার) সৃষ্টি,
- গিলতে অসুবিধা বা ক্ষুধানষ্ট,
- তিল বা আচিলের পরিবর্তন, যথাঃ হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়া,
- অস্বাভাবিক রক্তপাত-কাশি, পায়খানা, প্রস্রাব কিংবা মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্তপাত।
- ক্ষত যখন বাড়তে থাকে কিংবা সারেনা,
- পায়খানার নিয়ম পরিবর্তন।

ক্যান্সার নির্ণয়ের সুপারিশ ঃ

- ক্যান্সারের যে কোন বিপদ সংকেত দু'সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- প্রতি বৎসর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন
- প্রতি মাসে স্তন পরীক্ষা করান
- জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ মতে বিশেষ পরীক্ষা প্রয়োজন।

যে দুটো ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব

- ধূমপান নিঃসন্দেহে ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। এ বদভ্যাস অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। এর কুফল প্রমাণিত। ধূমপান করলে ব্রংকাইটিস্ বা দীর্ঘদিন ধরে কাঁশি ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। ধূমপান না করলে মোটামুটিভাবে আপনি ফুসফুসের ক্যান্সার থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন।
- ভাইরাস নামের এক ধরণের জীবাণু লিভার ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। নানাভাবে এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে। বিশেষ করে একই সিরিঞ্জে বিভিন্ন লোককে ইনজেকশন দেয়া হলে। তাছাড়া, রক্তদান, মুখে একই থার্মোমিটার

ব্যবহার, থুথু, মায়ের দুধ এবং শরীরের নানা নির্গত পদার্থের মাধ্যমে ভাইরাস বিস্তৃতি লাভ করতে পারে।

- মাদক দ্রব্য (এলকোহল) লিভারের জন্য ক্ষতিকর। লিভারের এ ধরনের রোগ থেকে সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সার হতে পারে।

- কাজেই একই ইনজেকশনের সিরিঞ্জে অপরকে ইনজেকশন না দেয়া উচিত। যদি দিতেই হয় কমপক্ষে আধঘন্টা ফুটন্ত পানিতে সিরিঞ্জ সিদ্ধ করে ব্যবহার নিরাপদ।

মনে রাখতে হবে আজকাল অল্প দামের ডিসপোজেবল বা একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়ার মত সিরিঞ্জ পাওয়া যায়। এগুলো ব্যবহার নিরাপদ ও উত্তম।

- মাদকদ্রব্য একাধিক কারণে পরিহার করতেই হবে। ইনজেকশনে সতর্কতা অবলম্বন করলে অহেতুক ইনজেকশন না দিলে এবং মাদকদ্রব্য থেকে বিরত থাকলে লিভার ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব।

তামাক পাতা, জর্দা, গুল থেকে
মুখে ক্যান্সার হয়

ইনজেকশনের বিপদ

যখন তখন ইনজেকশন দেবেন না।

ইনজেকশনের কারণে যে কয়টি রোগ হতে পারে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- জণ্ডিস
- ম্যালেরিয়া
- সিফিলিস
- সাম্প্রতিককালের মারাত্মক যৌনব্যাধি 'এইড্‌স'
- যেখানে মুখে ওষুধ খাওয়ানো সম্ভব সেখানে ইনজেকশন দিয়ে উপকার পাওয়ার চেয়ে উপরোক্ত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া কিছুতেই উচিত নয়।
- কোন না কোন কারণে যদি ইনজেকশন দিতেই হয়, বিত্তবানদের জন্য ডিস্‌পোজেবল সিরিঞ্জ (প্লাস্টিকের সিরিঞ্জ, যা একটা ইনজেকশন দেওয়ার পর ফেলে দিতে হয়) ব্যবহার করা উচিত।
- গরীবদের বেলায় অথবা যেখানে এটা ব্যবহার সম্ভব নয়, সেখানে সিরিঞ্জ ও সুঁচ কমপক্ষে আধঘন্টা ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করবেন।
- তাদের বেলায় ডিস্‌পোজেবল সিরিঞ্জ একাধিকবার ব্যবহার করতে পারেন। তবে একজনকে ইনজেকশন দিয়ে সেটা দিয়ে আর একজনকে দেওয়া যাবে না।

দুইটি উপকারী জিনিস আছে যাহা অধিকাংশ মানুষ হেলায় হারায় ও যাহার মুল্য সে জানে না -- একটি স্বাস্থ্য, অন্যটি অবসর।

-রাসুলুল্লাহর বাণী

পুষ্টি সম্বন্ধে কিছু কথা

আমরা জানি বাঁচতে হলে খেতে হয়। পেট ভরে খেলেই কিন্তু শরীরের সব প্রয়োজন মেটে না, সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য চাই পুষ্টিকর ও সুষম খাবার।

সুষম খাবার–

সুষম খাবারে ছয় প্রকার উপাদান পরিমিত পরিমাণে থাকা দরকার শ্বেতসার, আমিষ বা প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি।

সকল খাদ্যদ্রব্যে এসব উপাদান সমানভাবে থাকে না। কোন খাদ্যে এসব উপাদানের কোনটি বেশী কোনটি কম থাকে। তাই সুষম খাবার পেতে হলে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু খাওয়া দরকার।

খাদ্য উপাদানের কাজ ও তাদের উৎস ঃ

● শ্বেতসার বা শর্করা ঃ

শ্বেতসার শরীরে শক্তি ও কাজ করার ক্ষমতা যোগায়। চাল, গম, যব, কাউন, বার্লি প্রভৃতি শস্যে শ্বেতসার বেশী থাকে। আলু, মিষ্টি আলু, শালগম, কচু এই সব মূল জাতীয় খাদ্যে শর্করা আছে। চিনি ও গুড় অতি পরিচিত শর্করা।

● আমিষ বা প্রোটিন ঃ

আমিষ শরীর গঠনে সহায়তা করে। শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য আমিষের প্রয়োজন খুব বেশী।

মাছ, ডিম, দুধ, মাংস, মুসুর, মুগ, মাসকলাই, ছোলা বা বুট, বরবটি, দেশী সিম, মটরশুটি ইত্যাদিতে প্রচুর আমিষ থাকে।

● চর্বি ঃ

চর্বি শরীরে কর্মক্ষমতার উৎস হিসাবে কাজ করে।

সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, তিলের তেল, ঘি, মাখন, চর্বিযুক্ত মাছ ও মাংসে এ জাতীয় উপাদান আছে।

মায়ের পুষ্টি ঃ

সুস্থ ও স্বাস্থ্যবতী মা-ই কেবলমাত্র স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্ম দিতে পারে। পুষ্টিহীন মায়ের সন্তানের জন্মকালীন ওজন কম হয়। তারা পরবর্তীতে নানা অসুখে ভুগে। গর্ভবতী ও প্রসূতি অবস্থায় মায়েদের খাবারের প্রয়োজন সাধারণ অবস্থায় প্রয়োজনের তুলনায় বেশী।

- মায়ের খাবারে ডাল, মাছ , ডিম, শাকসবজি এসব থাকতে হবে।

মায়ের বুকের দুধ উৎপাদনের জন্য বেশী করে পানি খেতে হবে। চিন্তামুক্ত ও আনন্দচিত্ত হতে হবে এবং শিশুকে দুধ খাওয়ানোর আন্তরিক সৎ ইচ্ছা থাকতে হবে।

বার্ধক্যে পুষ্টি ঃ

বয়স বাড়লে কাজ করার ক্ষমতা কমে এবং খাবারের চাহিদা কমতে থাকে। এ বয়সে চিনি, গুড়, গ্লুকোজ এসব খাবার পরিমাণে কম খেতে হয়। চর্বি ও তেল জাতীয় খাবার পরিমাণে অনেক কমিয়ে আনতে হবে। এ সময় প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা উচিত। এতে খাবার হজমে সুবিধা হয় এবং পায়খানা পরিষ্কার হয়। চল্লিশের উপর বয়স হলে ঘি, মাখন আর ডিম খাওয়া কমাতে হবে, ওজন বাড়তে থাকলে শর্করা জাতীয় খাবার কমিয়ে ফেলতে হবে। নইলে হৃদরোগ হতে পারে।

রান্নার সঠিক পদ্ধতি ঃ

- ভাতের মাড় কখনও ফেলবেন না, এতে অনেক পুষ্টি উপাদান থাকে। প্রয়োজনমত পানি দিয়ে ভাত রান্না করুন।
- রান্নার সময় পাত্রের মুখ ঢেকে রাখুন।
- তরকারী সিদ্ধ করে পানি ফেলে দিবেন না। এতে অনেক উপকারী উপাদান পানির সাথে বের হয়ে যায়।
- খাদ্যদ্রব্য অনেকক্ষণ ধরে রান্না করবেন না।
- অধিক তাপে ভিটামিনের অপচয় বেশী হয়।
- খুব পাতলা করে সবজির খোসা ছাড়ানো উচিত।
- সম্ভব হলে খোসাসহ তরকারী রান্না করলে পুষ্টি উপাদানের অপচয় হয় না।
- শাকসবজি কাটার আগে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন, কাটার পর ধুবেন না।
- শাকসবজি কাটার পর কখনও পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন না।
- শাকসবজি ক্ষেত থেকে তোলার সাথে সাথে রান্না করে খাবার অভ্যাস করুন। টাটকা শাকসবজি বেশী পুষ্টির যোগান দেয়।
- শাকসবজি ছোট টুকরা না করে বড় বড় করে কাটুন।
- গাজর, টমেটো, বিট, ক্ষীরা, শসা, পুদিনা পাতা, ধনেপাতা রান্না না করে সালাদ বানিয়ে খেলে পুষ্টি উপাদান বেশী থাকে।

- সূর্যের আলোতে দুধ রাখবেন না। এতে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। দুধ না ফুটিয়ে খাবেন না।

৬ থেকে ১২ মাস বয়সের শিশুর দৈনিক খাদ্য তালিকা

শিশু যতবারই মায়ের দুধ খেতে চাইবে ততবারই খেতে দেবেন, তাছাড়া মায়ের দুধের সাথে সাথে দৈনিক নিম্নলিখিত তোলা খাবারগুলো দিবেন।

উপকরণ	*পরিমাণ*
• খিচুড়ী (চাল+ডাল+ছোটমাছ/মাংস+ তেল+শাকসবজি)	চা চামচের ৬ চামচ
• সম্ভব হলে ডিম	১টা
• আলু (ছোট)	১টা
• হালুয়া (সুজি+তেল+গুড়)	২ চা চামচ
• পাকা কলা/আম/পেঁপে/যে কোন মৌসুমী ফল	পরিমাণ মত

আয়োডিনের অভাব

বাংলাদেশে প্রায় ৮ কোটি মানুষের বিভিন্ন মাত্রার আয়োডিনের অভাব রয়েছে এবং প্রায় ৫ কোটি মানুষের মধ্যে গলগন্ড বা গলগন্ডের লক্ষণ রয়েছে।

আমাদের দেশের মাটিতে ও পানিতে পর্যাপ্ত আয়োডিন না থাকায় উৎপন্ন খাদ্যে আয়োডিন কম থাকে। এর অভাবে যা হতে পারে,

- দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী

যেমন ঃ- বোবা, কানা, ট্যারা হাঁটতে অসুবিধা ইত্যাদি

- শারীরিক বিকলাঙ্গতা • গর্ভপাত • মৃত সন্তান প্রসব
- মাসিকজনিত সমস্যা

আয়োডিন যুক্ত খাবার, লবণ খেলে এসব সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। গৃহপালিত পশুকেও আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়ানো উচিৎ।

১ থেকে ৫ বৎসরের বাচ্চার পুষ্টির পরিমাপ ঃ

বাচ্চার বাহুর মধ্যভাগের পরিধি মেপে নির্ণয় করা যেতে পারে।
যদি ১৩.৫ সেঃমিঃ বা তার উপর হয় তাহলে স্বাভাবিক আছে।
,, ১২.৫ – ১৩.৫ সেঃ মিঃ হয় - সীমারেখায় আছে
,, ১২.৫ সেঃ মিঃ এর কম হয় তাহলে বুঝতে হবে শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।

১ থেকে ৫ বৎসরের বাচ্চার সঠিক ওজন ঃ

নবজাত	৩.৫ কেজি	=	৭.৭ পাউন্ড
২ মাস	৪.৫ ,,	=	১০ ,,
৪ ,,	৬.৫ ,,	=	১৪ ,,
৮ ,,	৮.৫ ,,	=	১৮.৭ ,,
১ বৎসর	১০ ,,	=	২২ ,,
৩ ,,	১৫ ,,	=	৩৩ ,,
৫ ,,	১৮ ,,	=	৪০ ,,

(১ কেঃ জি ঃ = ২.২ পাউন্ড)

তামাক একটি গুলিভর্তি পিস্তল
সময়েই এর বিস্ফোরণ

কোলেস্টেরল

রক্তে এই চর্বিজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশী হলে ধমনীর গায়ে এটা জমা হয়। ফলে ধমনীর অভ্যন্তরীণ ব্যাসের পরিমাণ এবং সম্প্রসারণ ক্ষমতা লোপ পায় এবং রক্তসঞ্চালন বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন প্রকারের চর্বিজাতীয় পদার্থ শরীরের রক্তে প্রবাহিত হয়। এদের অনেক নাম থাকলেও শিক্ষিত মহলের কাছে 'কোলেস্টেরল' (যা এদের মধ্যে প্রধান) একটা পরিচিত নাম।

নানা প্রকারের হরমোন উৎপাদনে কোলেস্টেরল অপরিহার্য। কোলেস্টেরল শুধু খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে না, যকৃতেও এটা তৈরী হতে পারে। 'ট্রাইগ্লিসারাইড', 'ফসফোলিপিড' প্রভৃতি চর্বিজাতীয় পদার্থ কোলেস্টেরলের মতোই ক্ষতিসাধন করতে পারে। রক্তে এইসব চর্বিজাতীয় জিনিসকে দ্রবীভূত হওয়ার জন্য প্রোটিন বা আমিষের সাথে সংযুক্ত হতে হয়। এই সংযুক্তির ফলে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তার নাম 'লাইপোপ্রোটিন'। নানা প্রকার লাইপোপ্রোটিন রক্তে পাওয়া যায়। এগুলোকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায় ঃ যেমন অল্প ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (LDL –এতে প্রধানতঃ কোলেস্টেরল রয়েছে) এবং উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (HDL)।

কোলেস্টেরলসমৃদ্ধ এই অল্প ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিনের আধিক্য ধমনীর গায়ে দ্রুত মাত্রায় তৈলাক্ত পদার্থ জমতে সাহায্য করে। কাজেই যাঁদের শরীরে এর পরিমাণ বেশী তাঁদের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী, এমনকি তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সেও। উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিনের বেলায় ঘটে এর উল্টোটা। এটা বরং ধমনীর গায়ে চর্বি জমার প্রতিবন্ধক এবং এটা শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

শরীরে কোলেস্টেরলের আধিক্য প্রধানতঃ দু'টো কারণে হতে থাকে। একটা বংশগত; অপরটা জন্মের পর বিভিন্ন বিপাকজনিত রোগের কারণে। এ-সমস্ত রোগের মধ্যে রয়েছে বহুমূত্র, থাইরয়েড হরমোনের স্বল্পতা, নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইত্যাদি। পরিশ্রমবিমুখ, মেদবহুল ব্যক্তি, মদ্যপায়ী, অতিমাত্রায় চর্বিজাতীয় খাদ্যগ্রহণকারীদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশী থাকে। পক্ষান্তরে যাঁরা শারীরিক পরিশ্রম করেন, পরিমিত খাবার গ্রহণ করেন এবং উক্ত বিপাকজনিত রোগে আক্রান্ত নন, তাঁদের শরীরে উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে। তাই

যাঁদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশী তাঁদের সাবধান হতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে চিকিৎসা করাতে হবে।

চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে কোন বিপাকজনিত রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করা, মাত্রাতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য বর্জন ও শারীরিক পরিশ্রম করা। কোলেস্টেরল কমানোর জন্য বিভিন্ন সময় নানা ওষুধের উপকারিতা দাবি করা হলেও এ-পর্যন্ত এমন কোন ওষুধ নেই বললেই চলে। কোলেস্টেরল কম পরিমাণে আছে এ রকম খাবার গ্রহণ করাই উত্তম এবং এটাই কোলেস্টেরল কমানোর মহৌষধ। সম্পৃক্ত চর্বি (Saturated fat) শরীরে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি সহায়ক। তাই সম্পৃক্ত চর্বিসমৃদ্ধ খাবারের পরিবর্তে অসম্পৃক্ত চর্বি (Polyunsaturated fat) গ্রহণ করা কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রাধান্য পেলেও বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন এটা অধিক পরিমাণে ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। অসম্পৃক্ত চর্বি শস্যজাতীয় উপাদান যেমন সয়াবিন, তুলা বীজ, সূর্যমুখী বীজ, ভূট্টা প্রভৃতি থেকে পাওয়া যায়। আর সম্পৃক্ত চর্বি পাওয়া যায় প্রধানতঃ প্রাণিজ খাবার থেকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে যে সব খাবার মাত্রার বেশী গ্রহণ করা উচিত নয় সেগুলো হচ্ছে চর্বিযুক্ত মাংস, ডিমের কুসুম, মাখন, পনির, ঘি, পূর্ণমাত্রার দুধ (Full cream milk), ডালডা এবং এই সকল উপাদানে তৈরী খাবার।

খাদ্যদ্রব্য	*কোলেস্টেরল* (প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যে কত মিলিগ্রাম)
ডিমের কুসুম	৪৬৮
গরুর মাংস	১২৫
মুরগীর মাংস	৬০-৯০
ভেড়ার মাংস	৭০
পনির (আমেরিকা)	১৫৭
ক্রিম	১০০
আইসক্রিম	৪৩
গরুর দুধ	১৪

এ ছাড়া মগজেও প্রচুর পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকে।

খাবারে কুসংস্কার

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। যে কয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্য যুক্তিতর্কের অবকাশ রাখে না, এটা তার অন্যতম। শুধু স্বাস্থ্য বৃদ্ধির জন্য নয়,বেঁচে থাকার তাগিদেও খাবারের দরকার।

খাবারের প্রয়োজনীয়তা আদি যুগেও মানুষের অজানা ছিল না। বস্তুতঃ খাবার সংগ্রহ ছিল তাদের প্রধান কাজ। সব প্রাণী খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায় স্থান পরিবর্তন করে, এমনকি দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা অজানাকে জেনেছি। খাবারের প্রতিটি উপাদান বিশ্লেষণে সক্ষম হয়েছি, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় এমনকি ক্ষতিকর খাবার চিনতে পেরেছি। মোট কথা চাহিদা অনুসারে গুণাগুণ বিচার করে সুষম খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করা আমাদের আয়ত্তে।

কুসংস্কার একটা ব্যাধি। এই সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিরাজমান, যে কোন বিষয় নিয়ে কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে। খাবার নিয়ে যে সব কুসংস্কার এদেশে প্রচলিত এখানে তার উপর কিছু আলোচনা করব।

শিশুদের বেলায়

জন্মের শুরুতেই–

জন্মের প্রথম তিনদিন শিশুদের বুকের দুধ না দেয়া একটা বহুল প্রচলিত কুসংস্কার। এই সময় বুকের দুধ একটু ঘন এবং হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। যাকে বলা হয় 'কলস্ট্রাম'। অনেকের ধারণা, এটা বিষাক্ত এবং অনেক ক্ষতিকর জিনিস এতে থাকে। খেলে নবজাতকের ক্ষতি হয় ভেবে স্তনে চাপ দিয়ে বের করে এটাকে ফেলে দেয়া হয়। অথচ এই কলস্ট্রামে বিষতো দূরে থাক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সম্পন্ন উপাদান থাকে এবং তা নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বুকের দুধ যে কয়দিন শিশুকে দেয়া হয় না, সে কয়দিন শিশুকে শুধু পানি, সামান্য মধু বা চিনি মিশানো পানি খাইয়ে রাখা হয়। এতে শিশুর বলতে গেলে প্রথম তিন দিন অনাহারে কাটে, ফলে একদিকে পুষ্টিহীনতা, অন্যদিকে কলস্ট্রাম থেকে বঞ্চিত হওয়াতে জন্মলগ্ন থেকে শিশুর যে প্রতিরোধ শক্তি হবার কথা, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়।

মায়ের দুধ বনাম গরুর দুধ

অনেকেই মনে করেন গরুর খাঁটি দুধ খাওয়ানো হচ্ছে,অতএব মায়ের দুধের দরকার কি? ঝামেলা করতে যাব কেন? এটা একটা ভুল ধারণা। ভিটামিন 'সি' গরুর দুধের চেয়ে মায়ের দুধে বেশী থাকে। লোহাও থাকে বেশী। ভিটামিন 'সি' লোহার শোষণ বাড়ায়। গরুর দুধের চেয়ে মায়ের দুধে ভিটামিন 'সি' বেশী থাকায় লোহার শোষণ ঠিকমত হয়, গরুর দুধে তা হয় না। তাছাড়া গরুর দুধ সিদ্ধ করলে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে যায়। তৈল জাতীয় খাবার শিশুদের শক্তি যোগায়। মায়ের দুধ এবং গরুর দুধে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল থাকে। লাফালাফি, ছুটাছুটি এবং খেলাধূলায় শিশুদের অনেক শক্তির (ক্যালোরি) প্রয়োজন। তৈল বহুলাংশে সেই শক্তি যোগাতে পারে। কোন না কোন কারণে শিশু যদি বুকের দুধ বা গরুর দুধ কোনটাই না পায় তখন কিছু তৈল জাতীয় খাবার তাকে দিতে হবে। এই কারণে শিশুদের মাখন তোলা দুধ (স্কীমড) খাওয়াতে নেই। এই দুধে তৈল জাতীয় উপাদান থাকে না বলে শক্তির পরিমাণ খুব কম এবং শিশুর পুষ্টির জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। চীনা বাদাম এবং সয়াবিন, তৈলের উৎস হিসাবে শিশুদের জন্য উপযোগী খাবার।

মায়ের দুধ শিশুদের জন্য উত্তম সুষম খাদ্য। পুষ্টি উপাদান শিশুদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন মায়ের দুধে ঠিক ততটুকুই থাকে। এটা তাদের জন্যই তৈরী, এটা শুধু নিরাপদ নয়, এটা নির্ঝনঝাটও বটে। কিনতে হয় না, তৈরী করতে হয় না, বাসি হয়না, গরম-ঠাণ্ডার ঝামেলা নেই, শিশি-বোতল-গ্লাস চামচ কোনটাই দরকার হয় না। এ দুধ খাওয়ানো মা ও শিশু উভয়ের জন্য উপকারী। বুকের দুধ খাওয়ালে প্রসবের পর মায়ের জরায়ু স্বল্পসময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং পুনঃ গর্ভধারণের সম্ভাবনা বিলম্বিত হয়। এছাড়া মা ও শিশু পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে বলে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। মোট কথা মায়ের দুধের বিকল্প নেই। অন্য কোন দুধ এর সমান হতে পারে না। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমরা যেন বিভ্রান্ত না হই।

অন্যান্য খাবার

শিশুর খাবার নিয়ে কুসংস্কার একাধিক। অনেকে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে জানেন না অথবা দিতে চান না। বিশেষ করে গ্রামে এক বৎসর পর্যন্ত শিশুকে দুধ

ছাড়া অন্য কোন খাবারই দেওয়া হয় না। তাদের ধারণা এগুলো শিশুর পক্ষে হজম করা সম্ভব নয়।

অনেক শিক্ষিত পরিবারেও চার পাঁচ মাস বয়স থেকে শিশুকে অন্য খাবার দেয়া হয় না। অথচ এ বয়সে শিশুরা পরিবারের সব খাবার খেতে পারে। সে সব খাবার নরম হলেই হল।

অন্যদিকে শিশুদের শাকসবজি দেবার কথা ভাবতে পারেন না। এগুলোর অভাবে শিশুদের ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ 'এ' এর অভাব হতে পারে। ফলে কেউ কেউ রাতকানা এমনকি অন্ধও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এসব খাবারে অন্যান্য ভিটামিন এবং লৌহ জাতীয় পদার্থ থাকে বলে এগুলোর অভাবে শিশুর রক্তহীনতা এবং বিভিন্ন পুষ্টিহীনতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ অজুহাত দেখান তাদের বাচ্চা দুধ-ছাড়া অন্য কিছু খেতে চায় না অথবা খেতে পারে না। এটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অতি সামান্য থেকে শুরু করে চেষ্টা চালাতে থাকলে শিশুকে বিভিন্ন খাবারে অভ্যস্থ করে তোলা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়।

অসুখে-বিসুখে

ডায়রিয়া ঃ

ডায়রিয়া বা ঘন ঘন পায়খানা হলেই অনেকে বিশ্বাস করেন এটা খাবারের ফলে হয়েছে। এমন কিছু না কিছু খাওয়ানো হয়েছে যা শিশুর সহ্য হচ্ছেনা। এতেই ডায়রিয়ার উৎপত্তি। এধারণা সম্পূর্ণ ভুল হলেও বহুল প্রচলিত। সামান্য পাতলা পায়খানা হলেও এ ধারণার বশে অনেকে খাবার বন্ধ করে দেন। শুধু বার্লি আর সাগু দিতে থাকেন। এতে শিশুর যা প্রয়োজন সে তা পায়না। শরীর থেকে যা বেরিয়ে যাচ্ছে তা পূরণ হয় না, তদুপরি যা চাহিদা, তাও মেটানো হয় না। পরিণতি সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন জীবনরক্ষাকারী রাসায়নিক পদার্থ, লবণ ও পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় বলে এগুলোর ঘাটতি পূরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে,অন্যথায় পরিণতি ভয়াবহ হবার সম্ভাবনা থাকে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। কলেরা হলে ধরে নিতে হতো মৃত্যু অবধারিত। লবণ-গুড়-সরবত আবিষ্কারের ফলে এ মৃত্যুর হার এখন অনেক নিচে। প্রতি একশত জন কলেরা রুগীর নিরানব্বই জনকে সুস্থ করে তোলা এখন সম্ভব।

ডায়রিয়ার বেলায়ও একই কথা। তাছাড়া আমরা এখন প্রমাণের উপর ভিত্তি করে জানি, শিশুদের ডায়রিয়া খাবারের দোষ, কিংবা বদহজমের লক্ষণ নয়। এই রোগ নানা ধরণের ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ফল। ফলে খাবার বন্ধ করে নয়, শরীর থেকে যা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা পূরণ করে, নিয়মিত খাবারের মাধ্যমে পুষ্টিমান বজায় রেখে এবং প্রয়োজন বোধে জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করে চিকিৎসা করতে হবে।

লবণ-গুড়ের সরবতের সাথে স্বাভাবিক খাবারও দিতে হবে। এর পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। এ সময় মায়ের দুধ বন্ধ করার কোন যুক্তি নেই। মায়ের দুধে এলার্জি হতে পারে বলে যে ধারণা, তা ভুল। কাজেই ডায়রিয়া হলে শিশুর স্বাভাবিক খাবার বন্ধ করার কোন যৌক্তিকতা নেই বরং মায়ের দুধ বন্ধ করা নিষ্ঠুরতার সামিল।

হাম হলে–

মাতৃগর্ভ থেকে প্রাপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মের পাঁচমাস পর্যন্ত শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। যেমন ধরুন মায়ের যদি কোনদিন হাম হয়ে থাকে, তার অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতা নবজাত শিশুর শরীরে প্রবেশ করে এবং জন্মের পাঁচমাস পর্যন্ত থাকে। ফলে এ সময় তাদের হাম হয় না। এরপর ছয়মাস থেকে দেড় বছরের মধ্যে নানা ধরণের সংক্রমণের ফলে শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে না। এ সময় তাদের নানা রোগে ভুগা অস্বাভাবিক নয়।

শিশুদের হাম নিয়ে কুসংস্কার অনেকের মনে বদ্ধমূল। হামের প্রতিষেধক টিকা এখন পাওয়া গেলেও আর্থিক এবং অন্যান্য কারণে অনেকেই এটা নিতে সক্ষম নন। অদূর ভবিষ্যতে এ রোগের প্রকোপ কমবে, এমন আশা করা যায় না।

হাম হলে বুকের দুধ, মাছ, মাংস এবং অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে শিশু দুর্বল হয়ে পড়ে। অপুষ্টি এবং রোগের শিকার হয়, অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। পাতলা পায়খানা হওয়া এ সময় অস্বাভাবিক নয়। এটা হোক আর না-ই হোক, খাবারের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না। বরং পুষ্টিকর খাবার দেয়া বাঞ্চনীয়।

মিষ্টিতে কৃমি–

অনেকেই মনে করেন মিষ্টি খেলে কৃমি হয়। এই উদ্ভট ধারণার উৎপত্তি কোথা থেকে জানা নেই । মনে হয় কেউ কোনদিন শিশুকে মিষ্টি না দেয়ার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিলেন। আর তা এ যাবৎ চলে আসছে।

মিষ্টি খেলে কৃমি হয় না। হবার কোন কারণ থাকতে পারেনা। এতে কৃমির উৎপত্তি বা বংশ বৃদ্ধি কোনটাই হয় না। অতএব কৃমি হলেও মিষ্টি নিষেধ নয়।

শিশুর মলে–

শিশুর মল নিয়ে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে তারা যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করে। তাদের মল তেমন বিপজ্জনক নয় বলে অনেকেই মনে করেন। এদের ধারণা, বয়স্কদের মল অধিক বিপজ্জনক। এটা সম্পূর্ণ ভুল। শিশুর মলে অনেক জীবাণু থাকে। এটা রোগ বিস্তারের অন্যতম প্রধান একটা উৎস। মায়েরা অল্প পানি দিয়ে বাচ্চাদের মল ধুইয়ে তেমন কোন সাবধানতা অবলম্বন না করে অন্য বাচ্চাদের খাবার পরিবেশন করেন, কোলে নেন, আদর করেন। এর ফলে পরিবার যেখানে পরিকল্পিত নয়,এক পরিবারে যেখানে অনেক শিশু, রোগ বিস্তার সেখানে অতি সহজ।

অনেকেই বলে ভাল পানি না পেলে শৌচকর্মের জন্য খাবার পানি কতই বা খরচ করবেন। পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে এটাই আসল কথা। ভাল পানি পাওয়া না গেলে অপরিষ্কার পানি ব্যবহার করতে হবে। পরিমাণে পর্যাপ্ত হলেই হল। ছাই দিয়ে হাত মুছে পরিষ্কার করাও নিতান্ত বিজ্ঞানসম্মত। এতে এ্যালকালি বা ক্ষার আছে বলে জীবাণু টিকে থাকতে পারে না।

মায়ের বেলায়–

মায়ের বয়স, স্বাস্থ্য এবং গর্ভকালীন খাবারের সাথে শিশুমৃত্যু হারের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অথচ অল্প বয়সে বিবাহ আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে বহুল প্রচলিত। গর্ভবতী মায়ের অপরিমিত খাবার একটা ব্যাপার। খাবারের বেলায় আর্থিক সংগতি যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী কুসংস্কার। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পুষ্টি প্রয়োজন। এর বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে। তাই গর্ভবতী মায়ের বাড়তি খাবারের দরকার। বিশেষতঃ গর্ভধারণের শেষের তিন চার মাস থেকে বর্ধিত খাবারের প্রয়োজন খুবই বেশী। প্রশ্ন হচ্ছে বেশীর ভাগ লোকের যেখানে দু'বেলা পরিমিত খাবার জোটেনা, সেখানে বাড়তি খাবার আসবে কোথাথেকে।

দামের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে পুষ্টিমানের কোন সম্পর্ক থাকে না। সুষম খাদ্য স্বল্পদামেও সম্ভব।

গর্ভাবস্থায়–

গর্ভাবস্থায় কেউ কেউ ডাল, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খান না। তাদের ধারণা, এগুলো খেলে পেটে অসুখ করবে, বাচ্চার ক্ষতি হবে। এমন কি অনেকেই মনে করেন ডিম খেলে বাচ্চার হাপানি এবং মৃগেল মাছ খেলে মৃগী হতে পারে। কুসংস্কারের শিকার হয়ে গর্ভবর্তী মায়েরা অপুষ্টিতে ভুগেন। ফলে গর্ভজাত শিশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোজা কথায় গর্ভবতী মায়ের জন্য কোন খাবার নিষিদ্ধ হবার কোন কারণ নেই।

প্রসবের পর–

সন্তান প্রসবের পর মায়েদের অনেক সময় আতুর ঘরে বন্দী করে রাখা হয়।

ভাতের সাথে হলুদ বাটা, মরিচ বাটা এবং নিরামিষ খাওয়ানো হয়। ফলে তারা অপুষ্টিতে ভুগে, নানা রোগে আক্রান্ত হয়, বুকের দুধের পরিমাণ কমে যায় এবং শিশু উপযুক্ত পুষ্টি পায় না। এমনি করে মা ও শিশু উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গর্ভবতী মা এবং বুকের দুধ দানকারী মা উভয়েরই বাড়তি খাবারের প্রয়োজন।

জ্বর হলে–

যে কোন কারণে জ্বর হলে রুগীদের খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। সাগু, বার্লি, ডাবের পানি ইত্যাদি দেয়া হয়। এমনকি দুধ পর্যন্ত দেয়া হয় না। অথচ জ্বরের সময় দেহের তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তির প্রয়োজন হয় বেশী এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালরী তথা খাবারের প্রয়োজন। এসব বিধি নিষেধের ফলে রুগী দুর্বল হয়ে যায় এবং উপসর্গ দেখা দেয়। শুধু কারণ দূরীভূত হলেও সুস্থতা অর্জনে সময় লাগে বেশী।

সাধারণতঃ ধরে নেয়া যায় প্রায় সব রোগেরই খাবার নিয়ে তেমন কোন বিধি নিষেধ নেই। রুগী যদি বমি করতে থাকে আর পেটে কিছু না রাখতে পারে বা পেটে ব্যথা বা অস্বস্তিবোধ করে অথবা পেট ফাঁপা থাকে, তাহলে সাবধান হতে হবে। উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

কলেরা,আমাশয়, উদারাময়ে–

কলেরা, আমাশয়, উদারাময় প্রভৃতি রোগে এখন আর খাবারের নিষেধ নেই। এ সেদিন পর্যন্ত এসব রুগীকে খেতে দেয়া হত না। ফলে মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশী। লবণ-গুড় এর সরবত ব্যবহারের ফলে মৃত্যুর হার এখন অনেক কম।

জণ্ডিস বা পাণ্ডু রোগে-

নানা কারণে জণ্ডিস হতে পারে। পিত্তথলিতে পাথর অন্যতম প্রধান কারণ হলেও ভাইরাসজনিত জণ্ডিসের প্রকোপ অনেক কারণে বেড়েই চলেছে। একাধিক ভাইরাস লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস করতে পারে। কারণে, অকারণে ইনজেকশন, স্যালাইন কিংবা রক্ত গ্রহণ এই রোগ বিস্তারের কারণ। সম্প্রতি এর প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হলেও দামের দিক দিয়ে এটা কয়েকজন বিত্তশালী ছাড়া প্রায় সকলের নাগালের বাহিরে। এ ধরণের জণ্ডিসের কুফল এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা এসব রুগীর খাওয়া দাওয়ার ভুল ধারণা বা কুসংস্কার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করব।

সাধারণতঃ দেখা যায় জণ্ডিস হলে অনেক খাবার বন্ধ করে দেয়া হয়। শুধু দেয়া হয় গ্লুকোজ আর স্যালাইন। তার সাথে কিছু এন্টিবায়োটিক আর দু-একটা ভিটামিন। ভাইরাসের উপর এন্টিবায়োটিকের কোন কার্যকারিতা নেই। ভিটামিন খাবারের সমতুল্য হতে পারে না। যদি তাই হতো, তাহলে খাদ্য সমস্যাই থাকতো না। খাবারের পরিবর্তে অনেকে ভিটামিন খাওয়া শুরু করে দিত। গ্লুকোজ এককভাবে খাবারের প্রয়োজন মিটাতে পারে না। বেশী করে গ্লুকোজ খেলে বমির ভাব হয়। অন্য কিছু খাবার সামান্য রুচিটুকুও থাকে না। সুষম খাদ্যের অভাবেই রুগী দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই স্বাভাবিক নিয়মে যে সময়ের মধ্যে এটা নিরাময় হওয়া সম্ভব, তা বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

এককালে বলা হতো এবং পাঠ্য পুস্তকে লেখা থাকতো যে, জণ্ডিস হলে মাছ, মাংস, চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া নিষেধ। এ ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। দেখা গেছে, এসব রুগী যদি ঠিকমত খেতে পারে, তাদের রোগ সময় মত সারে। মোট কথা জণ্ডিস বা পাণ্ডুরোগে খাওয়া-দাওয়ার উপরে যে নিষেধ রয়েছে, এটা আসলে একটা কুসংস্কার, কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। রুগী যা খেতে চায়,তা সে খেতে পারে । বরং তার খাদ্য যদি সুষম না হয়, বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে সেটাকে সুষম করা বাঞ্চনীয়। যেমন গরিব হলে ভাত কিংবা রুটি, ডাল, শাকসব্জি, একটু অবস্থা ভাল হলে তার সাথে মাছ, মাংস, ডিম, দুধের সংযোজন করা যেতে পারে। আর কেউ যদি মাখন খেতে চায় তাতেও নিষেধ নেই।

স্যালাইনের বন্যা ঃ

সম্প্রতি স্যালাইন দেয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে মাথা ব্যথা, পা ব্যথা থেকে আরম্ভ করে কারণে অকারণে স্যালাইন দেয়া হয়। আবার অনেকে এসে বলেন, “ডাক্তার সাহেব, আমার একমাত্র অসুখ দুর্বলতা। ৭-৮টা স্যালাইন নিয়েও কোন ফল পাইনি।” এটা রুগীর অপরাধ নয়। তার বিশ্বাস জন্মেছে, বরং এ বিশ্বাস জন্মানো হয়েছে যে, স্যালাইন দিলে দুর্বলতা সারে। এখন দেখা যাক কথাটা আসলে যুক্তিসঙ্গত কি না। পানি ও লবণের সংমিশ্রণে তৈরী হয় স্যালাইন আর তার সাথে গ্লুকোজ থাকলে স্যালাইন গ্লুকোজ, গ্লুকোজ থাকুক আর নাই থাকুক, যে উদ্দেশ্যে এগুলো দেয়া হয়, স্যালাইন তা পূরণ করতে পারে না। শরীরে কেবলমাত্র লবণ জলের ঘাটতি হলে বিশেষ বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করে স্যালাইন কিংবা গ্লুকোজ স্যালাইন দেয়া হয়। লবণ গুড়ের সরবত প্রবর্তনের ফলে স্যালাইন ইনজেকশনের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে গেছে।

খাবারের বিকল্প স্যালাইন হতে পারে না। এটা শুধু একটা বিশেষ ঘাটতির সম্পূরক হতে পারে। সে যাই হোক, যে ভাইরাসজনিত জণ্ডিস নিয়ে আলোচনা করছি তাতে স্যালাইন কিংবা গ্লুকোজ স্যালাইনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। উপকারীতার প্রশ্নই উঠে না। এতে রুগীর হয়রানি, স্বাস্থ্যহানি, আর্থিক ক্ষতি এবং রোগের বিস্তার হয়। খাবারের পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সহজ সরল অসহায় রুগী এভাবে ক্ষতির শিকার হন।

পেপটিক আলসার ঃ

পেটে আলসার (যাকে সাধারণ লোকে ‘গ্যাষ্টিক বলে জানে) হলে খাবার সম্বন্ধে অনেক বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়। এক ঘন্টা পর পর কিছু খাওয়ার জন্য নির্দেশনামা কাগজে ছাপিয়ে কেউ কেউ ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। এতে আরও লেখা থাকে ঘন্টায় ঘন্টায় দুধ খেতে হবে, রাত্রে শোয়ার সময় এক গ্লাস দুধ খেতে হবে ইত্যাদি। এগুলো মান্ধাতার আমলের ভুল ধারণা।

দুধের আমিষ এবং ক্যালসিয়াম পাকস্থলীতে অম্লক্ষরণ বাড়ায়। তাহলে রাতে শোয়ার সময় দুধ খেলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশী। অথচ এটা একটা বহুল প্রচলিত কথা। অবশ্য চা, কফি খেলে অম্লক্ষরণ বাড়ে, এগুলো না খাওয়া ভাল। সামান্য মরিচ মসলা দিয়ে খাবার তৈরী করলে তাতে আলসারের ক্ষতি হয় এমন যুক্তি সঙ্গত কারণ

নেই। কোন রুগীর কোন খাবার খেলে আলসারের ব্যথা বাড়বে এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। রুগীর অভিজ্ঞতার আলোকে যে খাবারে এমন হয়, সেটা বাদ দিতে হবে। মোট কথা খাবারের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে এবং সে হিসাবে এগুলোকে বাছাই করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে বাদ দিতে হবে।

ঘন ঘন খাবারের উপদেশ মানসিক ও পারিবারিক অশান্তির কারণ হতে পারে। চিকিৎসার দিক দিয়ে বরং কুফল ডেকে আনে। যারা অফিসে কাজ করেন, ঘন ঘন খাবার তাদের অনেকেরই পক্ষেই সম্ভব নয়। বাসায় ঘন ঘন খাবার গ্রহন পরিবারের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, অশান্তির সৃষ্টি করে। আলসারের দিক দিয়ে এটা অম্লক্ষরণের সহায়ক। আর্থিক দিক দিয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং সামাজিক দিক থেকে উৎপাত হিসাবে দেখা দেয়। আসল কথা আলসার রুগীর উপর খাবারের বোঝা চাপানোর কোন বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি নেই। তাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে সময়মত খেতে হবে এই যা।

পুষ্টিকর খাবার

দামে আর মানে ঃ

খাবারের প্রয়োজনে ক্ষুধা লাগে। যে কোন কিছু খেয়ে পেট ভরালেই শরীরের প্রয়োজন মিটেনা। সুষম খাদ্য খেতে হবে। খাবারের সংমিশ্রণ যত বেশী হয়, তত সুষম হয়। সুষম খাদ্য পেতে হলে নানা ধরণের খাবারের সংমিশ্রণ দরকার। দাম কম হলে খাবার খারাপ হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন ধরুন আটা ও চালে প্রায় সমপরিমাণ শক্তি (ক্যালরি) আছে। চালের চেয়ে আটার দাম কম। চালে প্রায় ৭% আমিষ থাকে আর ভাতের পরিবর্তে রুটি খেলে অথবা ভাতের পরিমাণ কমিয়ে আটা ব্যবহার করলে দুটোর সংমিশ্রণে পুষ্টিমান বেড়ে যায়।

ডালে প্রায় ২৫% আমিষ থাকে। আর এতে শক্তি রয়েছে চালের মতই। ডাল-ভাত এবং ডাল-রুটি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শক্তি এবং আমিষের চাহিদা মোটামুটি ভাবে পূরণ করতে পারে।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ এবং খনিজ লবণ (মিনারেল) বিশেষ করে আয়রনের অভাব আমাদের দেশে অনেকের মধ্যে দেখা যায়। মা ও শিশুর মধ্যে এর প্রকোপ বেশী। বিভিন্ন রকমের শাক আমাদের দেশে প্রায় সব সময় পাওয়া যায়। এসব শাকে প্রচুর

পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ থাকে। পুষ্টির দিক থেকে গাঢ় বর্ণের শাক সবচেয়ে ভাল। অতএব দেখা যায় চাল অথবা আটা, ডাল এবং শাক অথবা সবজি এই তিনের সমন্বয় একটা সুষমখাদ্য।

আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, আমাদের দামী খাবারগুলো যেমন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি শাকসবজি জাতীয় খাবার থেকে উৎপন্ন হয়। গরু-ছাগল শুধু সবুজ গাছ-গাছড়া খেয়ে মাংস বৃদ্ধি করে, দুধ দেয়। অন্যদিকে হাঁস মুরগিও গাছ-গাছড়া এবং বিভিন্ন শাকসবজি খেয়ে শরীর বৃদ্ধি করে ও পুষ্টিকর ডিম দেয়। অথচ অনেকের কাছে শাকসবজির কদর কম। আপেল, আঙ্গুর, কমলা লেবু দামের বহরে অভিজাত খাবার। সস্তা বলে পেয়ারা আর আমলকির কদর নেই। অথচ গুণের দিক দিয়ে এগুলোর মান অনেক বেশী। ভিটামিন 'সি' থাকে প্রচুর।

চিনির দাম বাড়লে গরীবদের হতাশ হবার কারণ দেখি না। তাদের বলতে হবে চিনির বদলে গুড় খেতে। এটা চিনির চেয়ে ভাল। এতে লোহা (আয়রন), ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য উপাদান থাকে যা চিনিতে নেই।

শাকসবজি কাঁচা খাওয়ার চেয়ে রেঁধে খাওয়ার প্রবণতা আমাদের দেশে বেশী। শাকসবজি বেশীক্ষণ সিদ্ধ করলে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়। যে সব সবজি কাঁচা খাওয়া যায় সেগুলো রান্নার পরিবর্তে কাঁচা বা সালাদ হিসেবে খেলে বেশী ভিটামিন পাওয়া যায়। এছাড়া কাঁচা শাকসবজি প্রায় সময় কেটে পানিতে পরিষ্কার করা হয়। এভাবে পরিষ্কার করলে পানিতে দ্রবণীয় খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন 'সি'র অনেকটা অপচয় হয়। এগুলো পানি দিয়ে পরিষ্কার করে কাটলে অপচয় কম হয়।

অনাদৃত খিচুঁড়ি ঃ

বৃষ্টি-বাদলার দিনে খিচুঁড়ি খাবার প্রবণতা এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। কেউ কেউ এটাকে সৌখিনতা বলে ধরে নেন। আবার অনেকে মনে করেন এটা গরীবের খাবার। চাল, ডাল, শাকসবজি দিয়ে সাধারণতঃ খিচুঁড়ি করা হয়। তাছাড়া ডিম, আলু, কাঁচাকলা ইত্যাদিও কখনও কখনও মিশানো হয়। আসলে বহু উপাদানের সংমিশ্রণে এটা তৈরী করা হলেও চাল, ডাল ছাড়া খিচুড়ি হয় না।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খিচুড়ি একটা সুষম খাদ্য। এটা তৈল কিংবা ঘি দিয়ে তৈরী করা হয়। আমাদের খাবারে সাধারণতঃ চর্বি জাতীয় উপাদান কম থাকে, এটা তৈল বা ঘি এর অভাবপূরণ করে। কাঁচাকলা সংমিশ্রণে ভিটামিন এবং লোহার পরিমাণ বাড়ে।

রান্নার দিক থেকে এটা সহজ। সময় ও জ্বালানী খরচ দুই-ই বেঁচে যায়। খিচঁড়িতে যে কয়টি উপাদান দেয়া হয় তার প্রত্যেকটি যেমন চাল আর ডাল আলাদা আলাদা রান্না করতে হলে যে সময় লাগে, দুটো মিশিয়ে রান্না করতে সময় লাগবে এর অর্ধেক। এরকম প্রতিটি উপাদান হিসাব করলে দেখা যায় কত অল্প খরচে এবং কম সময়ে এটা তৈরী করা সম্ভব।

বয়সের দিক থেকেও খিচুঁড়ি ব্যবহারের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। পাঁচ মাসের শিশুদের খিচুড়ি খাওয়ানো সম্পূর্ণ নিরাপদ। এটা তাদের শরীর গঠনে সাহায্য করে। হাত দিয়ে পিষে আঙ্গুল দিয়ে শিশুদের খিচুড়ি খাওয়ানো মা এবং শিশু উভয়ের জন্য তৃপ্তিদায়ক। বড় এবং বুড়োদের বেলায়ও খিচুড়ির একই গুণ। মোট কথা সব বয়সের মানুষের জন্যে এটা একটা সুষম খাবার।

স্বল্প খরচে আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুষম খাদ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের অতি পরিচিত এবং বহুলাংশে অনাদৃত এই খিচুড়ি।

সবুজে সোনা–

ডাল-ভাত আমাদের সাধারণ খাবার। সকলে এদুটো খেয়ে থাকেন। ঘন ডাল খাওয়া যুক্তিসঙ্গত হলেও আর্থিক কারণে অনেকের ভাগ্যে তাও জোটে না। পাতলা করে হলেও এরা ডাল খান। অবশ্য পাতলা ডাল অনেকে খেয়ে থাকেন কুসংস্কারের বশে। কথায় বলে সবুজের দেশ–বাংলাদেশ। আমি বলি সবুজ শাকের দেশ। পথ-ঘাট,মাঠ, পাহাড়-পর্বত,যেখানেই যাই না কেন, যে কোন ঋতুতেই কিছু না কিছু শাক পাওয়া যাবেই।

এর আগে শাকের গুণাগুণ নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে শাক সুষম খাদ্যের একটি বিশেষ অংশ। যে শাকের এত গুণ, তাকে আমরা কদর দিতে শিখিনি। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং আভিজাত্যের বড়াই নিয়ে যে শাককে এতদিন অবহেলা করেছি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আজ তা সমাদৃত। কবির ভাষায় শাক এখন সবুজ সোনা। একে নিয়ে রচিত হয়েছে জারী গান। সম্প্রতি পুষ্টি ও খাদ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যে গানটি আমার হস্তগত হয়েছে তারই কিছু অংশের এখানে উদ্ধৃতি দিলাম। পাঠক সমাজ এটা উপভোগ করবেন, উপকৃত হবেন,শাকের গুণাগুণ সম্বন্ধে খানিকটা অবহিত হবেন, এ আশা রাখি।

সবুজ সোনার কথা
(জারী গান)

শোনরে দেশবাসী ভাই
সোনার কথা বইলা যাই
সোনার বাংলায় আছে যত সোনা
এই দুনিয়ায় নাই তার তুলনা
ওরে নাই তুলনা নাই
শোনরে দেশবাসী ভাই ....
কচুর পাতা গুণের রানী
শাকের রাজ্যে মধ্যমণি।
পালং, লাল শাক, সরিষা সাজনা
কোনটাই নয় যে ফেলনা
এরাই মোদের সবুজ সোনা
অল্প দামেই যায় যে কেনা
শালগম, পিয়াজ, বীট, গাজর মূলা
কিছুই না তার যায় যে ফেলা
মূল এদের ভাল কিন্তু আরও ভাল পাতা
খাদ্য গুণে ভরা হলেও দামে অনেক সস্তা
এই শাকেরে তুচ্ছ কইরা স্বাস্থ্য না হারাই
হাতের ধন পায়ে ঠেইলা কপাল না চাপড়াই
শোনরে .... ভাই ....
চল এবার আমরা সবাই
এই কথাটি সত্য বইলা যাই
শাক খাব ভাই রাশি রাশি।

খাবার সম্বন্ধে আরও কিছু কথা

- দামীখাবার উপকারী, সস্তা খাবার খারাপ এ ধারণা ভুল।
- ভিটামিনের জন্য টেবলেট কিংবা ক্যাপসুল এর চেয়ে প্রাকৃতিক খাবারই উত্তম।
- তাজা শাক-সবজি এবং ফলমূলে প্রায় সব রকমেরই ভিটামিন পাওয়া যায়।
- ভিটামিন 'এ'-এর অভাব অন্ধত্বের প্রধান কারণ। এ রোগ হলে অল্প আলোতে কিংবা রাত্রে দেখতে অসুবিধা হয়, চামড়া খসখসে হয়ে যায়।
- ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবারের মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, মাখন, সবুজ রং এর শাক, পালং শাক, পুঁইশাক, কচু শাক, পাট শাক, গাজর, পাকা পেপে, আম, কাঠাল, পেয়ারা, আনারস, লাল শাক ইত্যাদি।

ভিটামিন 'বি' অনেকগুলো ভিটামিনের সমষ্টি বি১ বি২ বি৩ ও বি৬ বি১১ (ফলিক এসিড) বি১২ ভিটামিন। বি১২ এর অভাব আমাদের দেশে হয় না বললেই চলে।

(ক) ভিটামিন 'বি'১ঃ এর অভাবে 'বেরিবেরি' হয়। চাল, সিম, বরবটি, মটরশুটি, ডাল, মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম ইত্যাদিতে এ ভিটামিন প্রচুর পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে চাল, ডাল, ভুট্টা, সিম, মটরশুটি, শাক, দুধ এগুলোতে ভিটামিন 'বি' পরিবারের সবগুলো পাওয়া যায়।

(খ) ভিটামিন 'বি' ২ঃ এর অভাব হলে জিহ্বা এবং মুখের কোনায় 'ঘা' দেখা দিতে পারে। ভিটামিন 'বি'২ সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় দুধে।

(গ) ভিটামিন 'বি'৩ (নিকোটিনিক) এর অভাব হলে পেলাগ্রা হয়। চামড়া খসখসে, কালো হয়ে যাওয়া, ঘন ঘন পায়খানা, জিহ্বায় ঘা, পায়ে রস দেখা দিতে পারে। মাংস, কলিজা, গম, বাদাম, শাক-সব্জি ইত্যাদিতে এ ভিটামিন পাওয়া যায়।

(ঘ) ভিটামিন 'বি'১১(ফলিক এসিড) গর্ভবতী এবং দুগ্ধবতী মায়েদের এ ভিটামিনের প্রয়োজন খুব বেশী। গাঢ় সবুজ শাকে এ ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। এছাড়া লিভার (কলিজা,যকৃত), কিডনী ইত্যাদিতেও থাকে।

- ভিটামিন 'সি' এর অভাব হলে দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়তে পারে, (স্কার্ভি) চামড়ায় লাল লাল দানা উঠতে পারে, ক্ষত স্থান শুকাতে সময় লাগতে পারে।

ভিটামিন 'সি' যে কোন তাজা শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। টক জাতীয় ফল যেমন- লেবু, টমেটো, আমলকি, পেয়ারা, কালো জাম, কাঁচা মরিচ ইত্যাদিতে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে থাকে।

- ভিটামিন 'ডি'ঃ হাঁড় এবং শক্ত দাঁত হবার জন্যে এই ভিটামিনের প্রয়োজন। এর অভাবে বাচ্চাদের রিকেট এবং বড়দেরও ঐ ধরনের (অস্টিওমেলেশিয়া) রোগ দেখা দেয়। বাচ্চাদের দাঁত উঠতে দেরী হয়, বসা-হাঁটা দেরী হয়, কারো কারো খিঁচুনি হতে পারে, হাঁড় বাঁকা হয়ে যেতে পারে, বড়দের শরীরে দুর্বলতা, হাঁড়ে ব্যথা এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী কুঁজো হয়ে যেতে পারে।

- মাখন, দুধ, ডিম, মাছ, মাছের তেল, পালং শাক ইত্যাদিতে ভিটামিন 'ডি' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মানুষের শরীরে চামড়ার উপর সূর্যের আলো পড়লেও ভিটামিন 'ডি' তৈরী হয়। সে জন্য যারা মাঠে ঘাটে কাজ করে, রোদে খেলাধূলা করে তাদের সাধারণতঃ ভিটামিন 'ডি' এর অভাব হয় না।

- ভিটামিন 'কে' এর অভাবে শরীরের নানা জায়গা থেকে রক্তপাত হতে পারে। সবুজ শাকসবজি, পনির, ডিম, ফুল কপি, বাধা কপি, পালং শাক ইত্যাদিতে এ ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

- ক্যালশিয়াম ঃ ভিটামিন 'ডি' এর মত ক্যালসিয়ামের অভাব হলেও রিকেট দেখা দিতে পারে। দুধ, ছানা, দধি, ডিম, মাছ, মাংস, পুঁই শাক, অন্যান্য সবুজ রং এর শাক, শিম, ডাল, পিঁয়াজ, সাজনাতে ক্যালসিয়াম থাকে।

তামাকের বিজ্ঞাপন সবই মিথ্যা

কুষ্ঠ
(লেপ্রোসী)

এ রোগের লক্ষণসমূহ ঃ

- চামড়ায় ফ্যাকাসে বা লালচে দাগ যাতে কোন ব্যথা থাকে না এবং চুলকায় না
- কান, মুখ বা অন্য কোন স্থানে দানা বা গুলটি দেখা দেয়
- হাত বা পায়ে অনুভূতির অভাব এবং মাংস শুকিয়ে যাওয়া
- চামড়া মোটা হয়ে যাওয়া
- পায়ের তলায় ঘা, যাতে ব্যথা থাকে না
- চোখের ভ্রূ উঠে যাওয়া।

উপরের কোন লক্ষণ কারো শরীরে দেখা দিলে চিকিৎসক বা নিকটস্থ কুষ্ঠ হাসপাতালে/কুষ্ঠ ক্লিনিক/থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/টিবি ক্লিনিকে যোগাযোগ করুন।

জেনে রাখুন ঃ

- কুষ্ঠ কোন অভিশাপ/বংশগত নয়
- কুষ্ঠ রোগ জীবাণু দ্বারা হয়
- চিকিৎসা করলে সম্পূর্ণ ভালো হয়
- বিনামূল্যে এর চিকিৎসা করা হয়
- ৮০ ভাগ কুষ্ঠ রোগী এ রোগ ছড়ায় না
- প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করলে বিকলাংগ হবার ভয় থাকে না
- কুষ্ঠ রোগীকে অবহেলা/ভয় করবেন না।

কুষ্ঠরোগ নির্মূল করতে এগিয়ে আসুন
সর্বস্তরের জনসাধারণ সহযোগিতা করুন

কয়েকটি বদ অভ্যাস ও ভুল ধারণা

কোষ্ঠকাঠিন্য

কোষ্ঠকাঠিণ্য এমন একটি অবস্থা যা প্রায় সকলের কোন না কোন সময় চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সপ্তাহে একদিন করে পায়খানা হয় এমন লোক যেমন আছে, তেমনি দিনে দুই তিন বার করে পায়খানা হয়এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে যেমন নিঃসন্দেহে কোষ্ঠকাঠিণ্য রুগী বলা যাবে না, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তেমনি কোষ্ঠকাঠিণ্য নয় বলে চিহ্নিত করা যায় না। সোজা কথায় কোষ্ঠকাঠিণ্য অনেকটা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

জোলাপের ক্ষতি

সপ্তাহে একবার করে জোলাপ খেলে শরীরের সব বিষাক্ত জিনিস বের হয়ে যাবে–এ ধারণা ভুল। জোলাপের পর পায়খানা,পায়খানার পর কোষ্ঠকাঠিন্য, কোষ্ঠকাঠিন্যের পর জোলাপ এমনি একটা বিষচক্রের সৃষ্টি হয়। ফলে অহেতুক পয়সা নষ্ট, স্বাভাবিক অভ্যাস নষ্ট এবং দীর্ঘদিন জোলাপ ব্যবহারে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। যেসব কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য সৃষ্টি হতে পারে তার মধ্যে কায়িক পরিশ্রমের অভাব, সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত কারণে নির্দিষ্ট সময়ে পায়খানার গতিবেগ প্রতিরোধ, স্বল্প পানি পান করা, খাবারের মধ্যে শাক সব্জি বা আঁশ জাতীয় জিনিসের অভাব ইত্যাদি প্রধান। কোষ্ঠকাঠিন্যে যে কয়েকটা সস্তা জিনিস নিরাপদ এবং উপকারী সেগুলো হলো শাকসবজি, ইছপগুলের ভুঁসি, বেল, আনারস, পেঁপে ইত্যাদি।

ভিটামিনের ক্ষতি

কোন কোন ক্ষেত্রে ভিটামিন দরকার হলেও পরিমাণে বেশী হলে এগুলো ক্ষতির কারণ হতে পারে। ভিটামিন বি১২ (যেমন সাইটামিন) এর প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। ভিটামিন সি সর্দি, কাশিতে কোন কাজে লাগে না, বরং দীর্ঘদিন ধরে ভিটামিন সি সেবন করলে মূত্রকোষে পাথর হতে পারে।

অনিদ্রা

শারীরিক অসুস্থতা অনিদ্রার কারণ হতে পারে, তবে অনেকক্ষেত্রে শারীরিক সুস্থতা সত্ত্বেও ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে। যেমন নুতন পরিবেশ, অতিরিক্ত আলো, দুশ্চিন্তা

ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে ওষুধ খেয়ে ঘুম আসলে সেটা ঘুম নয়, একটা কৃত্রিমতা। ওষুধ না খেয়ে কয়েকটা সহজ উপায়ে নিদ্রাহীনতার উপশম সম্ভব। যেমন বিকেল বেলায় খোলা জায়গায় হাঁটাহাটি, ব্যায়াম, শোবার সময় একগ্লাস গরম পানি কিংবা ভালভাবে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় যাওয়া, হাতে একটা কিছু নিয়ে শুয়ে পড়া, তছবী কিংবা মালা জপা, মৃদুসুরে গান শোনা ইত্যাদি।

দুএকদিন ঘুম না হলে দুশ্চিন্তা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। মনে রাখতে হবে এরকম দুএকদিন হলে ক্ষতির কোন কারণ নেই, কাজেই চিন্তার কোন কারণ নেই।

যে বিদ্যা হইতে কোন উপকার হয় না তাহা এমন ধনাগার যাহা হইতে আল্লাহর পথে কোন হিতকর্মে প্রদান করা হয় না –রাসূলুল্লাহর বাণী

হজমী ওষুধ

বাজারে নানা ধরনের হজমী ওষুধ বিভিন্ন নামে পাওয়া গেলেও এগুলো কোন কাজে লাগে না। এতে কোন উপকার নেই বরং টাকার ক্ষতি। কচিৎ দু একটা রোগে যা দরকার হয় তাও টেবলেট হিসেবে খেতে হয়। বিশেষজ্ঞের মতামত নেয়া এখানে দরকার। এগুলোতে হজমের সামান্য উপকার মনে হলেও আসলে ক্ষতি হতে পারে।

হঠাৎ হজমের ব্যাঘাত দেখা দিয়ে যদি এ অসুবিধে চলতে থাকে, খাবার ইচ্ছে যদি কমতে থাকে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

এর সাথে যদি ওজনও কমতে থাকে তাহলে অবহেলা করা ঠিক নয়।

যাদের বয়স যত বেশী
তাদের ঘুমের প্রয়োজন তত কম

আপনার ওজন যদি বেশী হয়

অতিভোজন এবং কম পরিশ্রম এ দুটো অথবা যে কোন একটি হলেও শরীরের ওজন বাড়ে। যাদের শরীরের ওজন বেশী তাদের রক্তচাপ, বহুমূত্র, হৃদরোগ, কোমর এবং হাটুব্যথা, হার্নিয়া, চর্মরোগ আরও অনেক জটিল রোগ হয়ে থাকে। যদি ওজন সীমিত রাখতে চান, পরিমিত খাবার খাবেন, যেটুকু খেতে পারেন তার চাইতে একটু কম খাবেন।

রীতিমত কাজকর্ম, ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম করার অভ্যাস করবেন। চিনি, মিষ্টি জাতীয় খাবার যথাসম্ভব বাদ দেবেন।

ঘি, মাখন, চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিহার করবেন। শাক-সবজি তরিতরকারী বেশী করে খেলে শরীরের আমিষের পুরো চাহিদা মিটবে।

ভাত কম খাবেন।

সম্ভব হলে খাবার সম্বন্ধে পারদর্শী লোকের কাছ থেকে এ ব্যাপারে উপদেশ নেবেন।

সহজ কথায় খাওয়া ও পরিশ্রমের ব্যাপারে গরিবী হালে চলতে হবে।

খাবার সম্বন্ধে শরীয়তের বিধান শ্রেষ্ঠ

পেটের ঃ

$\frac{১}{৩}$ ভাগ খাবার খাবেন।

$\frac{১}{৩}$ ভাগ পানি খাবেন।

$\frac{১}{৩}$ ভাগ খালি রাখবেন।

শিশুর খাবার

- শিশুদের জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই।
- কমপক্ষে দু-বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো উচিৎ।
- চার মাসের পর দুধ ছাড়া নানা রকম খাবার দেওয়া উচিত।
- হঠাৎ করে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করবেন না।
- ধীরে ধীরে দু-তিন মাস সময় নিয়ে বন্ধ করা উচিত।
- মা মারা গেলে কিংবা অন্য কোন কারণে মায়ের দুধ না পাওয়া গেলে দাইমার দুধ খাওয়ানো উচিত।
- আলগা দুধ খাওয়াতে হলে বোতল দিয়ে খাওয়াবেন না। বাটি এবং চামচ ব্যবহার করবেন। এগুলো পরিষ্কার রাখা সহজ।
- শিশুদের প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচবার খাওয়াবেন।
- শিশুর বয়স যত মাস তার দ্বিগুণ চায়ের চামচ ভর্তি গুড়ো দুধ দিবেন। যেমন, চার মাস বয়স হলে চা-চামচের আট চামচ দুধ, তার অর্ধেক অর্থাৎ দুই ছটাক ফুটানো গরম পানি মিশাতে হবে প্রতি বারে।
- গরুর দুধ খাওয়াতে হলে তিন পোয়া গরুর দুধে এক পোয়া ফুটানো পানি আর চার চামচ চিনি মিশাবেন। এরপর শিশুর বয়স যত মাস তার অর্ধেক ছটাক এক এক বারে খাওয়াতে হবে। যেমন ছয় মাস বয়স হলে প্রতিবারে তিন ছটাক।
- বুকের দুধ ছাড়া গরুর টাটকা দুধ অন্য দুধের চেয়ে ভালো।
- শিশুদের ফুলক্রীম দুধ দেবেন, হাফক্রীম দেবেন না।
- মায়ের দুধের সাথে শিশুকে নিম্নের যে কোন একটি খাবার দেওয়া যায় ঃ (ক) দুধ + সবজি

  (খ) ফলের রস, কলা, আনারস, পেঁপে, অর্ধসিদ্ধ ডিম।

  (গ) আলু + ডাল।

  (ঘ) সীম, মটরশুটি, ফুলকপি, টকবেগুন, শাকসবজি।

  (ঙ) মাছ
- শিশুদের খাবারে মরিচ মশলা ব্যবহার করবেন না।

ডায়বেটিস বা বহুমূত্র রোগ

এই রোগে রক্তে চিনির পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ী ভাবে বেড়ে যায়। এই রোগের জন্য বংশগত প্রভাব ও পরিবেশের প্রভাব দুটোই দায়ী। এটা কোন ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়। ইনসুলিন নামক রসের অভাবে এটা হয়ে থাকে। ডায়বেটিস সারা জীবনের রোগ। স্থূলকায় রুগীদের রোগ ওজন কমালে সেরে যেতে পারে। কিন্তু ক্ষীণকায় রুগীর রোগ একবার হলে কখনও সারে না। সে জন্য এ রোগের চিকিৎসা সারাজীবন চালাতে হয়। রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখলে প্রায়ই স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব।

ডায়বেটিস রোগের লক্ষণ

- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া
- খুব বেশী পিপাসা লাগা
- বেশী ক্ষিদে পাওয়া
- যথেষ্ট খাওয়া সত্বেও ওজন কমে যাওয়া
- ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করা
- চামড়া শুকিয়ে যাওয়া
- খোশ-পাচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ দেখা দেওয়া
- চোখে কম দেখা

বয়স্ক রুগীদের অনেক ক্ষেত্রে এসব লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষাতেই ডায়বেটিস ধরা পড়তে পারে।

কাদের বেশী ডায়বেটিস হয় ঃ

- তিন শ্রেণীর লোকের ডায়বেটিস হওয়ার আশংকা বেশী থাকে।
- যাদের বংশে যেমন বাবা মা বা রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়ের ডায়বেটিস আছে।
- যাদের ওজন অনেক বেশী।
- যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোন কাজ করেন না।

ডায়বেটিস রোগের জরুরী অবস্থা

রক্তে শর্করা বা চিনি খুব কমে যাওয়া

কারণ–

- বেশী পরিশ্রম করলে।
- ওষুধের পরিমান বেশী হলে।
- কম খাবার খেলে।
- ইনসুলিন নেয়ার পর খেতে দেরি হলে।

লক্ষণ ঃ–

- অসুস্থ বোধ করা।
- শরীর কাঁপতে থাকা।
- খুব বেশী ক্ষিদে পাওয়া।
- অস্বাভাবিক আচরণ করা।
- বুক ধড়ফড় করা।
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।
- বেশী ঘাম হওয়া।

করণীয় ঃ–

এ সমস্ত লক্ষণ দেখা দিলেই রুগীকে চা চামচের ৪–৮ চামচ চিনি পানিতে গুলিয়ে খাওয়াতে হবে। রুগী অজ্ঞান হলে গ্লুকোজ ইনজেকশন দিতে হবে বা তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

ডায়বেটিক কোমা ঃ

যে সব রুগীর ইনসুলিন দরকার, তাদেরই ডায়বেটিক কোমা হয়ে থাকে।

কারণ ঃ–

- বেশী খাবার খেলে
- সংক্রামক বা প্রদাহজনিত রোগ হলে
- ব্যায়াম না করলে।
- অন্য কোন রোগের উপসর্গ বা রোগ দেখা দিলে।
- পরিমাণের চেয়ে কম ইনসুলিন নিলে।

● রোগের চিকিৎসা বন্ধ রাখলে।

● ডায়বেটিসের বড়ি খেতে ভুলে গেলে।

লক্ষণ ঃ–

● খুব বেশী পিপাসা

● ঘন ঘন প্রস্রাব

● বমি বমি ভাব হওয়া

● দুর্বলতা বোধ করা

● ঝিমানো

● শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়া বা দ্রুত শ্বাস নেয়া

● চোখে ঝাপসা দেখা

● মাথা ধরা

● শ্বাসে মিষ্টি গন্ধ বের হওয়া।

করণীয় ঃ–

এ সমস্ত লক্ষণ দেখা দিলে ইনসুলিনের রুগী হলে ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

পায়ের যত্ন ঃ–

এ রোগে পায়ে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হতে পারে। কাজেই আঘাত কিংবা অন্য কোন কারণে ঘা হলে সারানো মুশকিল।

এ অসুবিধা এড়াতে হলে ঃ–

● পায়ে আঘাত লাগাবেন না।

● গরম পানি ঢালবেন না।

● নখ সাবধানে কাটবেন।

● পায়ে টাইট, ময়লা ও ভিজা মোজা পরবেন না।

ডায়বেটিস রুগীর খাদ্য ব্যবস্থা ঃ

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব।

অসুস্থ হলে ঃ–

যদি ডায়বেটিস রুগী অসুস্থ হয় বা নিয়মিত খাদ্য খেতে না পারে তবে প্রতি বেলায় ১ কাপ দুধ-বার্লি বা দুধ-সাগুএবং ফলের রস বা ডাবের পানি খাওয়াতে হবে। অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। কখনও না খেয়ে থাকা যাবে না।

বহুমূত্র রোগে যেগুলো খাওয়া নিষেধ

চিনি	গ্লুকোজ
চিনি দিয়ে তৈরী খাবার	গুড়
কেক্	খেজুর বা তালের রস
পেস্ট্রি	মধু
জ্যাম	মিছরী
জেলী	কোকাকোলা
মিষ্টি দুধ	সেভেন আপ্
মিষ্টি বিস্কুট	পেপ্সি ইত্যাদি
মিষ্টি পিঠা	

বহুমূত্র রোগে যেগুলো খেতে বাধা নেই

ফুল কপি	করলা
বাধা কপি	ঝিংগা
ওলকচু	চিচিংগা
মূলা	পটল
কাঁচা টমেটো	ধুন্দল
কাঁচা পেঁপে	চালকুমড়া
বেগুন	ডাটা
কাঁচা মরিচ	সাজনা
শশা	লাউ
খিরা	পাকা টমেটো
উচ্ছে	

পাকা টমেটো এবং বেগুন

দৈনিক এক পোয়ার বেশী নয়।

কালোজাম	মসল্লা
জাম্বুরা	চিনি ছাড়া চা
আমড়া	চিনি ছাড়া কফি
কামরাঙ্গা	
বাঙ্গি	
স্যাকারিন	
জামরুল	
ভিনেগার	

খাদ্য তালিকা নং ১ ক্যালরী- ১০০০

শর্করা -১৫০ গ্রাম, প্রোটিন - ৩৮ গ্রাম, ফ্যাট -২৮ গ্রাম

সকাল	আটার রুটি -৬০ গ্রাম (২ টা ছোট পাতলা)
	ডিম -১টা (সিদ্ধ করে)
	সবজি ইচ্ছামতো
	ফল যে কোন ১ টা
১১ টা	মুড়ি বা বিস্কুট - ১৫ গ্রাম
	ফল - যে কোন ১ টা
দুপুর	ভাত - ১৮০ গ্রাম (২ কাপ)
	মাছ বা মাংস - ৩০ গ্রাম (১ টুকরা)
	ডাল - ১৫ গ্রাম (১ কাপ মাঝারী ঘন)
	সবজি - ইচ্ছামতো
বিকাল	দুধ -১২০ মিলি লিটার (১ কাপ)
	(অথবা ডাল বা চিনাবাদাম - ৩০ গ্রাম)
রাত্রি	আটার রুটি - ৬০ গ্রাম (২টা ছোট পাতলা)
	মাছ বা মাংস - ৩০ গ্রাম (১ টুকরা)
	ডাল - ১৫ গ্রাম (১ কাপ মাঝারী ঘন)
	সবজি - ইচ্ছামতো
	রান্নার জন্য তেল - ১০ মিলি লিটার

খাদ্য তালিকা নং ২ ক্যালরী - ১৮০০

শর্করা - ২৭০ গ্রাম, প্রোটিন - ৬৮ গ্রাম, ফ্যাট - ৫০ গ্রাম

সকাল	আটার রুটি - ১২০ গ্রাম (৪ টা ছোট পাতলা) ডিম - ১টা সবজি - ইচ্ছামতো ফল যে কোন ১ টা
১১টা	মুড়ি বা বিস্কুট - ৩০ গ্রাম ফল যে কোন ১ টা
দুপুর	ভাত ৩৬০ গ্রাম (৪ কাপ) মাছ বা মাংস - ৬০ গ্রাম (২ টুকরা) ডাল ২৫ গ্রাম ($১\frac{১}{২}$ কাপ মাঝারী ঘন) সবজি - ইচ্ছামতো
বিকাল	দুধ - ১২০ মিলি লিটার (১কাপ) (অথবা ডাল বা চিনাবাদাম - ৩০ গ্রাম)
রাত্রি	আটার রুটি - ১২০ গ্রাম (৪টা ছোট পাতলা) মাছ বা মাংস - ৩০ গ্রাম (১ টুকরা) ডাল - ২৫ গ্রাম ($১\frac{১}{২}$ কাপ মাঝারী ঘন) সবজি - ইচ্ছামতো

রান্নার জন্য তেল - ৩০ মিলি লিটার

ডায়াবেটিসের সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থা

		ভাল	প্রান্তসীমা	খারাপ
রক্তে শর্করা (গ্লুকোজ)				
অভুক্ত	মিলি মোল/লিটার	৪.৪-৬.১	≤৭.৮	>৭.৮
খাবারের পর	ঐ	৪.৪-৮.০	≤ ১০.০	>১০.০
HbA_1c	%	< ৬.৫	≤ ৭.৫	>৭.৫

সূত্র ঃ- গাইড বই
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি

রোজার সময়ের নিয়ম

১। কখন ও কি পরিমাণে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হবে বা ট্যাবলেট খেতে হবে সেটা ভাল ভাবে আপনার চিকিৎসকের নিকট থেকে জেনে নিন। ইনসুলিন নির্ভরশীল ডায়াবেটিক রোগীর যদি প্রস্রাবে এসিটোন যাওয়ার প্রবণতা থাকে তাঁদের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত রোজা রাখা উচিৎ হবে না।

২। রোজার সময়ের জন্য বিশেষ খাবারের নিয়ম জেনে নিন। সেহরী খাবার শেষ সময়ের অল্প কিছুক্ষণ আগে খাওয়া বাঞ্ছনীয়। সেহরীর সময় নামমাত্র পরিমাণে খাবার খেয়ে রোজা রাখা উচিৎ নয়।

৩। রোজার দিনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই।

৪। রোজার দিন বিকালে দৈহিক পরিশ্রমের কাজ না করে বিশ্রাম নেওয়া ভাল।

৫। প্রস্রাব পরীক্ষা করতে হবে সেহরীর খাবারের পর সকালে (সেহরীর ৩/৪ ঘন্টা পর হতে পারে) এবং ইফতার খাওয়ার দুই ঘন্টা পর । এ বিষয়ে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রায়োজন।

পায়ের যত্ন

পা মানব দেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ডায়াবেটিস রোগের কারণে পায়ে নানা প্রকার অসুবিধা দেখা দিতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের অকার্যকারিতা ও রক্ত সরবরাহের অসুবিধার কারণে পায়ের অনুভূতিশক্তি কমে যায় এবং পায়ে আঘাত লেগে সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। এর ফলে পায়ে পচনশীল ঘা হতে পারে, ফলশ্রুতিতে পা কেটে ফেলতে হয়। সকল ডায়াবেটিস রোগীকে তাই পায়ের বিশেষ যত্ন নিতে হয়।

বহুমূত্র রোগে মধু নিষেধ।
নানা উপকার থাকলেও বহুমূত্রে মধু ক্ষতিকর।

রিউমেটিক ফিভার

বাতজ্বর (রিউমেটিক ফিভার)

বাতজ্বর আসলে কতগুলো উপসর্গ ও লক্ষণের সমষ্টি যা বিটাহিমোলাইটিক ষ্ট্রেপটোকক্কাস নামক এক প্রকার জীবাণু দ্বারা গলায় সংক্রমণের ফলে হয়ে থাকে। গলা ব্যথা হওয়ার ১ থেকে ৫ সপ্তাহ পর এই রোগ দেখা দেয়।

এই রোগ সাধারণতঃ পাঁচ থেকে পনের বৎসর বয়সে হয়। একের পর এক গিরায় আক্রমণ করে। দুই তিন দিন ফুলা থাকে। অন্য গিরা আক্রান্ত হলে আগের গিরায় ফুলা কমে যায়।

- একের পর এক এই ধরনের ব্যথাসহ গিরা ফুলে যাওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। গিরা ফুলার সাথে জ্বর থাকে। জ্বর কারও কারও বেশী হতে পারে।

- কখনও কখনও জ্বর এবং গিরা ফুলার সাথে শরীরে লাল লাল দানা দেখা যেতে পারে। বুক ধড়ফড়ানি থাকতে পারে এবং অস্বাভাবিক ভাবে হাত, পা, আঙ্গুল, জিহ্বা ঝাকুনিসহ নড়াচড়া করতে পারে।

- এই রোগ বার বার হতে পারে। সেইজন্য চিকিৎসার সাথে সাথে প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা করা উচিত। সময়মত চিকিৎসা না হলে কিংবা প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকলে হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হতে পারে।

- এই রোগ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে জ্বর, গলা ব্যথা ইত্যাদি হতে পারে।

জ্বর,গলা ব্যথা একের পর এক গিরায় ব্যথা বিশেষ করে পাঁচ থেকে পনের বৎসরের মধ্যে হলে রিউমেটিক ফিভার হিসাবে গণ্য করা উচিত। জ্বরের সময় প্যারাসিটামল টেবলেট উপযুক্ত পরিমাণে দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত। তার সাথে পেনিসিলিন টেবলেট উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়ানো প্রয়োজন।

পরবর্তী পর্যায়ে ২৫০ মিলিগ্রামের দিনে দুটি করে পেনিসিলিন টেবলেট অথবা অনেকদিন স্থায়ী ক্ষমতা সম্পন্ন পেনিসিলিন বার লাখ প্রতি এক মাস পর পর পনের বৎসর ইনজেকশন দেওয়া উচিত। অন্যথায় শেষ আক্রমণের পর বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এইভাবে ওষুধ চালানো উচিত।

এ রোগ নির্ণয়ে উপরোক্ত লক্ষণ ছাড়াও রক্তের বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে শুধু রক্তের রিপোর্টে পরিবর্তন দেখে অন্য লক্ষণ ছাড়া এ রোগের চিকিৎসা শুরু করা উচিত নয়। উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

বাতজ্বর হলে কি ক্ষতি হতে পারে?

বাতজ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সময় যাদের হার্টে প্রদাহ (Carditis) হয় তাদের পরবর্তীতে ভাল্ব আক্রান্ত হতে পারে। বাতজ্বরের কারণে হৃদযন্ত্রের ভাল্ব আক্রান্ত হওয়াকে বাতজ্বরজনিত হৃদরোগ বলা হয়।

প্রতিরোধ ও চিকিৎসা

এই রোগ দুইভাবে প্রতিরোধ করা যায়। যেমন-

● **সাধারণ ব্যবস্থা**

(ক) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঃ

অস্বাস্থ্যকর ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশ বা বস্তি এলাকায় বসবাসকারীদের মধ্যেই এ রোগ বেশী হয়ে থাকে। অতএব এ রোগের প্রতিরোধের জন্য প্রথমেই আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন।

(খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা

● **চিকিৎসা**

(ক) প্রাথমিক প্রতিরোধক ব্যবস্থা ঃ ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের গলায় প্রদাহ বা গলা ব্যথা হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা করানো হলে বাতজ্বরের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। এই ব্যবস্থাকে প্রাথমিক প্রতিরোধক ব্যবস্থা বলে। চিকিৎসা কিন্তু খুবই সহজ। শুধুমাত্র একটি বেনজাথিন পেনিসিলিন ইনজেকশনই এ ধরনের গলা ব্যথার চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একটানা ১০ দিন পেনিসিলিন ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিরোধক ব্যবস্থা ঃ যারা এক বা একাধিকবার বাতজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে বা বাতজ্বরজনিত হৃদরোগে ভুগছে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। এই ব্যবস্থায় প্রতি ৩/৪ সপ্তাহ অন্তর অন্তর একটি বেনজাথিন পেনিসিলিন ইনজেকশন নিতে হয়। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে দিনে ২ বার পেনিসিলিন ট্যাবলেট সেবন করা যায়। যে সব ছেলেমেয়ে বাতজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু হৃদযন্ত্রের কোন ক্ষতি হয়নি তাদের ৫ বছর এই প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে ১৩ বছরের নিচের

ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে তা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অবশ্য গ্রহণীয়। বাতজ্বরজনিত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গেলে এ ব্যবস্থা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আজীবন নিতে হবে।

উপসংহার ঃ

- ছেলেমেয়েদের গলা ব্যথাকে অবহেলা করবেন না, এ থেকে বাতজ্বর হতে পারে।
- বাতজ্বর হলে হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে।
- গলা ব্যথার দ্রুত চিকিৎসা নিন-বাতজ্বর প্রতিরোধ করুন।
- বাতজ্বর হলে নিয়মিত ইনজেকশন নিন, হৃদযন্ত্রকে নিরাপদ রাখুন।
- বাতজ্বরজনিত হৃদরোগীরা নিয়মিত ইনজেকশন নিন, হৃদযন্ত্রকে বাড়তি ক্ষতি থেকে বাঁচান।

যারা সব সময় নিজকে অসুস্থ ভাবে
তারা আজীবন অসুস্থই থাকে।

উচ্চ রক্তচাপ (ব্লাড প্রেসার)

উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন)

দেহের বিভিন্ন শিরা উপশিরার মধ্যে প্রবাহমান রক্ত শিরা-উপশিরার দেওয়ালে যে চাপের সৃষ্টি করে সেটার নাম রক্তচাপ। এর পরিমাণ যদি বেশী হয় তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার বলে। যাদের ব্লাড প্রেসার আছে তাদের শতকরা নব্বই জনের কোন কারণ জানা যায় না।

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের রক্তচাপ যদি সার্বক্ষণিক ১৪০/৯০ মিলি মিটার মার্কারি এর উপর থাকে তবে তার উচ্চরক্ত চাপ আছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই রক্তচাপ কিছুটা বাড়তে পারে। যেমন ৬০-৭০ বছর বয়সের একজন লোকের রক্তচাপ ১৬০/৯৫ মিলি মিটার মার্কারি পর্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়।

ব্লাড প্রেসারের লক্ষণ ঃ

লক্ষণ ছাড়াই অনেক লোক ব্লাডপ্রেসার নিয়েও মাসের পর মাস স্বাভাবিক মানুষের মত জীবন যাপন করতে পারেন কিন্তু ব্লাড প্রেসার ক্রমাগতভাবে তার শরীরের ক্ষতি করে যেতেই থাকে।

ব্লাড প্রেসারের লক্ষণ তিনভাগে দেখা দিতে পারে ঃ

১. শুরুতে কেবল ব্লাড প্রেসার বেশী থাকার জন্যই কিছু লক্ষণ হতে পারে। মাথা ব্যথা, বিশেষতঃ মাথার পেছন দিকে এবং ঘাড়ে সকালে ঘুম থেকে উঠার পর ব্যথা যা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে–এটাই সাধারণতঃ দেখা যায়। অন্য কোন ধরনের মাথা ব্যথাও হতে পারে। এ ছাড়াও মাথাঘোরা, কানে ভোঁ ভোঁ করা, দুর্বলতা, অল্পতেই বিরক্ত হওয়া, বুক ধড়ফড় করা, নিদ্রাহীনতা, মাথা ভার থাকা প্রভৃতি কারো কারো হতে পারে।

২. ব্লাড প্রেসার বেশী থাকার জন্যে ক্রমে ক্রমে হৃদপিণ্ডে ক্ষতি হবার জন্য অল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট বা বুক ব্যথা, রাত্রে হাঁপানী হতে পারে। মগজে (ব্রেইন) জটিলতার জন্য অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, প্যারালাইসিস, কথা বলা বন্ধ হওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। দৃষ্টি শক্তি আস্তে আস্তে কমে যেতে পারে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর পায়ের মাংস পেশীর ব্যথা হতে পারে।

৩. অন্য কোন রোগ থেকে ব্লাড প্রেসার এর উৎপত্তি হলে সেই প্রাথমিক রোগের লক্ষণও থাকতে পারে। কিডনী (বৃক্ক) রোগ ব্লাড প্রেসারের কারণ হলে মুখ বা পা ফোলা, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, বমি হওয়া ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

প্রস্রাব কমও হতে পারে আবার কোন কোন অসুখে অতিরিক্তও হতে পারে। ডায়বেটিস রোগ থাকলে বেশী পরিমাণে প্রস্রাব এবং ওজন কমে যেতে পারে।

আরও অনেক রোগ ব্লাড প্রেসারের প্রাথমিক কারণ হতে পারে এবং সেগুলোর বিভিন্ন লক্ষণ ব্লাড প্রেসারের সঙ্গে থাকতে পারে।

বয়সের সাথে স্বাভাবিক ব্লাড প্রেসারেরও তারতম্য হয়। আবার একই বয়সের পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যেও স্বাভাবিক ব্লাড প্রেসারের পার্থক্য আছে। উপরোক্ত তারতম্য বিবেচনায় রেখে একথা বলা যায়, যে কোন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বা মহিলার ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার যদি ৯৫ (মিলিমিটার পারদ) এর উপরে পাওয়া য়ায় তবে তার ব্লাড প্রেসার উচুঁতে আছে এবং চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। অথবা থ্রম্বোসিস, রক্তচাপ অতিরিক্ত বাড়ার ফলে খিঁচুনি (কণভালসন) জনিত মগজের অসুখ, রক্তক্ষরণ, রক্তজমাট, চোখের ভেতরে রক্তপাত। বৃক্কের বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিসাধন এমনকি শেষ পর্যন্ত বৃক্ক অকেজো হয়ে চিকিৎসার আয়ত্তের বাহিরে চলে যেতে পারে। প্রায় সবগুলো জটিলতাই সময়মত চিকিৎসা করে প্রতিরোধ করা যায় যদি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে রাখা যায়।

মনে রাখবেন–

আপনার যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে, আর আপনার যদি তার সাথে ধূমপান বা মদ্যপানের অভ্যাস থাকে তবে শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা অধিকতর এবং রক্তচাপজনিত জটিলতা অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। কাজেই এ সমস্ত অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত।

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

মনে রাখতে হবে যে, কারণহীন উচ্চরক্তচাপ কখনও সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। শুধু মাত্র প্রয়োজনীয় মাত্রায় নিয়মিত ওষুধ খেয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় এবং এই ব্যবস্থা আজীবন চালিয়ে যেতে হয়। ওষুধ খেয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক হলে অনেকে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন। ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়। জেনে রাখা ভাল যে, ওষুধ খাওয়ার কারণে রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা সারাজীবন চালিয়ে যেতে হবে। লবণ ও চর্বি জাতীয় খাবার কম খেতে হবে এবং নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করলে স্ট্রোক, অন্ধত্ব, হার্ট এ্যাটাক, কিড্‌নী ফেইলোর (কিডনী অকেজো হওয়া), গ্যাংগ্রীন (পঁচন) থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

স্ট্রোক

স্ট্রোক বলতে ব্রেইনের অসুখ বুঝায় হার্টের বা হৃতপিন্ডের নয়। এর চিকিৎসা আছে এবং প্রতিরোধও সম্ভব।

স্ট্রোকের লক্ষণ ঃ যদি হঠাৎ করেই

● শরীরের কোন অংশ যেমন - মুখমন্ডল, হাত, পা অথবা শরীরের যে কোন একটা অথবা একাধিক অংশ অবশ বা দুর্বল হয়ে যায় ●চোখে বিশেষ করে এক চোখে ঝাপসা দেখা যায় ● কথা বলতে অথবা বুঝতে অসুবিধা হয় ●মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ● হাঁটতে অসুবিধা হয় বা পড়ে যাওয়ার ভাব হয় ● প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয় ● অজ্ঞান হয়ে যায়।

স্ট্রোকর ঝুঁকি কাদের বেশী ?

● যাদের উচ্চ রক্তচাপ (প্রেসার) আছে ● যাদের বহুমূত্র রোগ (ডায়াবেটিস) আছে অথচ চিকিৎসা করান না। ● যাদের রক্তে চর্বির পরিমাণ বেশী।

● যাদের শরীরের ওজন বেশী। ● যারা বেশী ধূমপান বা মদ্যপান করেন।

● যাদের হার্টের অসুখ আছে বিশেষ করে বাতজ্বর ও ভাল্বের সমস্যা আছে।

● এছাড়াও জন্মগতভাবে ব্রেইনের শিরার অসুবিধা, ফুসফুসে প্রদাহ, শিরা শক্তহয়ে যাওয়া, রক্ত ক্ষরণের প্রবণতা ইত্যাদি রোগ থাকলেও স্ট্রোক হতে পারে। মনে রাখবেন বয়স যত বাড়বে স্ট্রোকের ঝুঁকি ততই বাড়বে।

● পরিবারে বাবার কিংবা মায়ের অথবা তাঁদের দিকের নিকট আত্মীয় -স্বজনের মধ্যে উপরোক্ত সমস্যাগুলো কিংবা এদের যেকোনটি থাকলে এই স্ট্রোক বা সমস্যাগুলো সাধারণ লোকের তুলনায় আপনার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

চিকিৎসা

● খুব তাড়াতাড়ি রুগীর চিকিৎসা শুরু করুন ● স্ট্রোক হয়েছে বুঝতে পারার সাথে সাথেই অথবা সন্দেহ হওয়া মাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অথবা আপনার নিজের ডাক্তারের পরামর্শ নিন e প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে ওঠার পর রুগীর জন্য ফিজিওথেরাপীর ব্যবস্থা নিন

প্রতিরোধ ঃ

● ওজন কমিয়ে ফেলুন ● ধূমপান, মদ্যপান ছেড়ে দিন

● রক্তচাপ বেশী থাকলে চিকিৎসা করান ● চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন করুন বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) ধরা পড়লে চিকিৎসা করান ● নিয়মিত ব্যায়াম করুন

● মানসিক চাপ পরিহার করার চেষ্টা করুন

সূত্র ঃ- কমিউনিটি স্ট্রোক ফাউন্ডেশন

অতিরিক্ত উপাসনার চেয়ে অতিরিক্ত বিদ্যা শ্রেয় এবং সংযমই ধর্মের অবলম্বন। সারারাত উপাসনা করার চেয়ে রাত্রে এক ঘন্টা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া ভাল– রাসূলুল্লাহর বাণী

মৃগীঃ-

এটা একটি রোগের নাম। এটা একটি অভিশাপ বা ভূতের কিংবা বান মারার ব্যাপার নয়। এর চিকিৎসা সম্ভব ।

লক্ষণ ঃ

হঠাৎ মাটিতে পড়ে যাওয়া
,, খিচুঁনি বা শরীরে ঝাঁকুনি হওয়া
,, অস্বাভাবিক আচরণ
,, হাত বা মুখে, অস্বাভাবিক নড়াচড়া বা খিচুঁনি
,, হাত থেকে কোনকিছু ছিটকে পড়ে যাওয়া
,, ছোট বাচ্চাদের শরীর ঝাঁকি খাওয়া
,, ছোট বাচ্চাদের ঘনঘন অমনোযোগী হওয়া
,, হাত থেকে বই, কলম ইত্যাদি পড়ে যাওয়া

বিশেষ লক্ষণ ঃ

খিচুঁনির সময় কাপড় -চোপরে প্রস্রাব, পায়খানা হয়ে যাওয়া
,, ,, জিহ্বা দাঁতের ফাঁকে পড়ে কেটে যাওয়া
,, ,, পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়া
ঘুমের মধ্যে খিচুঁনি হওয়া

মৃগী রোগ উঠলে ঃ

ধারালো জিনিস, আগুন, পুকুর, উঁচু জায়গা, বিছানা, রাস্তা থেকে রোগীকে দূরে সরিয়ে নেন।

রোগীর হাত পা চেপে ধরবেন না।

ঘনঘন এই রোগ উঠলে হাসপাতালে নেবেন।

কয়েকটি উপদেশ ঃ

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করবেন না।

ঘনঘন আক্রান্ত না হলে বাচ্চাদের স্কুলে যেতে দেবেন।

পুকুরে একা সাঁতার কাটবেন না। একটানা দুবছর এই রোগের লক্ষণসমূহ বা যে কোন ১ টি / ২ টি লক্ষণ বন্ধ না থাকলে গাড়ি চালাবেন না।

এইড্‌স্‌

এইড্‌স্‌ একটি ভাইরাসজনিত রোগ যার কোন চিকিৎসা নাই। কোন প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। এ রোগ হলে মৃত্যু অনিবার্য, সে কারণে এ রোগ সম্পর্কে সকলেরই জানা উচিত।

কিভাবে এ রোগ ছড়ায় ঃ

- এই রোগ আক্রান্ত পুরুষ অথবা মহিলার সাথে যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে
- এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে
- রোগীর ব্যবহৃত – সিরিঞ্জ ব্লেইড
  রেজার, ক্ষুর ব্যবহারের মাধ্যমে
- আক্রান্ত মা থেকে শিশুতে
  - গর্ভাবস্থায়
  - প্রসবকালে
  - বুকের দুধের মাধ্যমে

এইড্‌স্‌ প্রতিরোধে অবশ্য করণীয় ঃ

- পতিতালয়ে যাতায়াত বর্জন
- একাধিক এবং অবৈধ যৌন মিলন পরিহার
- রক্ত এবং রক্তজাত দ্রব্য শরীরে নেওয়ার পূর্বে এইড্‌স্‌ জীবাণুমুক্ত কিনা পরীক্ষা করে নেওয়া
- যে সমস্ত কারণে এ রোগ ছড়ায় তা বর্জন
- এইড্‌স্‌ আক্রান্ত মায়ের গর্ভধারণ না করা
- **এইড্‌স্‌ প্রতিরোধে ধর্মীয় নীতিমালার বিকল্প নাই।**

আর্সেনিক বিষয়ে জরুরী বার্তা

আর্সেনিক এক ধরনের ধাতব জাতীয় পদার্থ। ভূগর্ভস্থ মাটিতে এই পদার্থ প্রাকৃতিকভাবে থাকে। আর্সেনিক দূষিত পানি পান করার ফলে, দেহের আর্সেনিক সহ্য করার ক্ষমতা ছাড়িয়ে গেলে নানা ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়।

যেমন ঃ গায়ের চামড়ায় বাদামী বা কালো রঙের দাগ দেখা দেয়, হাত ও পায়ের তালু শক্ত এবং খসখসে হয়ে যায়। পরবর্তীতে হাত ও পায়ের তালুতে ফুসকুড়ির মত ছোট ছোট শক্ত গোটা দেখা দেয়। আর্সেনিকের প্রতিক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে জটিল রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

সম্প্রতি আমাদের দেশে বেশ কিছু এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের পরিমাণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পানি দীর্ঘ দিন পান করার ফলে কিছু মানুষ এর দূষণ প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের মনে রাখা উচিত একটি পর্যায় পর্যন্ত মানব দেহের আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধযোগ্য তারপরে বিপদ দেখা দেয়। অতএব আপনার এলাকায় আর্সেনিক সমস্যা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন ঃ

● আর্সেনিক দূষণহীন কোন নলকূপের পানি পাওয়া না গেলে কুয়া, নদী বা পুকুরের পানি ফুটিয়ে পান করুন।

● আর্সেনিক দূষিত সন্দেহজনক টিউবওয়েলের পানি ১২ ঘন্টা থিতিয়ে শুধু উপরের পানিটুকু পান করা যেতে পারে। থিতানোর জন্য পানি পরিষ্কার পাত্রে সংগ্রহ করুন। তারপর একটা পরিষ্কার কাপড়ে ফিটকিরির টুকরা বা দলা নিয়ে পরিষ্কার কাঠির মাথায় বেঁধে নিন। ঐ ফিটকিরি বিশিষ্ট কাঠির সাহায্যে পাত্রের সংগ্রহ করা পানি ভালভাবে ৩ থেকে ৪ বার নেড়ে নিন। তারপর পাত্রটি ঢেকে রাখুন। এর ১২ ঘন্টা পর ঐ পানির উপরের ২/৩ অংশ দুই পরত পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে পান করা যেতে পারে। নিচের পানি তলানীসহ গোবরের মধ্যে ফেলুন। ফিটকিরি বারবার ব্যবহার করা যাবে। এ পদ্ধতিতে আর্সেনিক দূষিত পানি প্রায় সত্তর ভাগ আর্সেনিক মুক্ত করা যায়।

● পানিতে আর্সেনিক দূষণ, কেমিক্যাল এর সাহায্যে দূষণমুক্ত করা যায় তাই আপদকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কেমিক্যাল প্যাকেটও ব্যবহার করা যায়।

● আর্সেনিক দূষিত পানি গোছল এবং ধোয়া-মোছার কাজে ব্যবহার করা যায়।

● মনে রাখবেন আর্সেনিক দূষণজনিত রোগ কোনক্রমেই ছোঁয়াচে নয় এবং বংশগত রোগও নয়।

● আর্সেনিক দূষিত পানি পান না করলে এবং পুষ্টিকর ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে আর্সেনিক দূষণজনিত রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায়।

আর্সেনিক দূষণের ফলে মানবদেহে প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ সমূহ

১। **প্রাথমিক পর্যায়ঃ** ক. চামড়ার রঙ কালো হয়ে যাওয়া, খ. চামড়া শক্ত ও খসখসে হয়ে যাওয়া, গ. চোখ লাল হয়ে যাওয়া, ঘ. শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ, ঙ. বমি বমি ভাব, বমি ও পাতলা পায়খানা।

২। **দ্বিতীয় পর্যায়ঃ** ক. বিভিন্ন স্থানে সাদা কালো দাগ, খ. হাতে ও পায়ের তালুতে শক্তগুটি ওঠা, গ. পা ফুলে যাওয়া, ঘ. প্রান্তীয় স্নায়ুরোগ, ঙ. কিডনি ও লিভারের জটিলতা।

৩। **তৃতীয় পর্যায়ঃ** ক. দেহের প্রান্তদেশীয় অঙ্গের পচন, খ. ত্বক, মুত্রথলি ও ফুসফুসের ক্যান্সার, গ. লিভারের কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া, ঘ. কিডনির কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ রোগীদের প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

আর্সেনিকোসিস রোগীদের প্রয়োজনীয় পরীক্ষাঃ প্রস্রাব, নখ, চুল, চামড়া ও রক্ত।

চিকিৎসা ও রোগ ব্যবস্থাপনা

ধীর বা ক্রনিক আর্সেনিকোসিস থেকে নিরাময় লাভের সুনির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা পদ্ধতি এখনো আবিস্কৃত হয়নি। দেখা গেছে, আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে যদি রোগী আর্সেনিক দূষিত পানি পান বন্ধ এবং নিরাপদ পানি গ্রহণ শুরু করে তাহলে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়। একই সঙ্গে যদি রোগী ভিটামিন ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে রোগ নিরাময় দ্রুত হয়।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে তা হলো, আর্সেনিক দূষণের ঘটনা জনামাত্র দূষিত পানি গ্রহণ বন্ধ করে দিতে হবে। আর্সেনিকোসিসের চিকিৎসায় প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো।

লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা

হাত ও পায়ের তালুর কেরাটসিস এর ক্ষেত্রে-

১। মলম সেলিসাইলিক এসিড ১০% (১০ গ্রাম এর সাথে ৯০ গ্রাম ভেসেলিন) ১২ বছরের নীচে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মলম সেলিসাইলিক এসিড ৫%।

২। মলম ইউরিয়া ৫-১০% (১০ গ্রাম ইউরিয়ার সাথে ৯০ গ্রাম ভেসেলিন)।

চিকিৎসা

ক. ভিটামিন এ দিনে ৫০০০০ আই ইউ পর্যন্ত

খ. ভিটামিন সি দিনে ৫০০ মিঃগ্রাম

গ. ভিটামিন ই দিনে ২০০ মিঃগ্রাম

ঘ. সম্পূরক খাদ্য ঃ প্রোটিন ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য।

সূত্রঃ- ডাঃ এ জেড এম ইফতিখার হোসেন
এমবিবিএস, এমপিএইচ (যুক্তরাষ্ট্র), পিএমআর (যুক্তরাষ্ট্র)
সহকারি প্রভাষক, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ, নিপসম।

ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ

যে সমস্ত কারণে গর্ভধারণ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে ঃ

বয়স ১৮ বৎসরের কম

বয়স ৩৫ বৎসরের বেশী

প্রথম গর্ভধারণ ৩০ বৎসরের উর্দ্ধ

পূর্ববর্তী প্রসব থেকে বর্তমান গর্ভধারণের ব্যবধান ১ বৎসরের কম।

গর্ভবতী হবার আগে ওজন ৩৮ কেজির কম, রক্তহীনতা, হৃদরোগ, কিডনী রোগ, ডায়বেটিস, উচ্চরক্তচাপ, এজমা, বিয়ের অনেক পরে গর্ভধারণ (কোন প্রতিরোধক ব্যবহার না করে)

বার বার গর্ভপাত হয়ে থাকলে

এর আগে পেটকেটে বা যন্ত্র ব্যবহার করে বাচ্চা বের করা হয়ে থাকলে

এর আগে প্রসবের পর ফুল পড়তে দেরি হয়ে থাকলে

এর আগে বাচ্চা হবার পর রক্তপাত কিছুদিন ধরে চলে থাকলে

এর আগে বাচ্চার ওজন ২ কেজির কম হয়ে থাকলে

এর আগে মরা বাচ্চা হয়ে থাকলে

এর আগে বাচ্চা হয়ে অল্পদিনের মধ্যে মারা গেলে

গর্ভধারণকালে নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখা দিলে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। গর্ভধারিণীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো উচিত।

- পা বা মুখ ফুলে যাওয়া
- কোন রক্তপাত হওয়া
- পেট বেশী বড় মনে হলে
- পেট বেশী ছোট মনে হলে
- মায়ের ওজন বৃদ্ধি কম মনে হলে
- দীর্ঘস্থায়ী মাথা ব্যাথা হলে
- দীর্ঘস্থায়ী বমি হলে
- বেশী জ্বর এবং কোন রকম খিচুঁনি হলে।

ধনুষ্টংকার

যদি কোন মহিলা ধনুষ্টংকারের পাঁচ ডোজ টিকা নেন তবে তার সন্তান জন্ম দেবার বয়স থাকা পর্যন্ত (১৫ – ৪৫) ধনুষ্টংকার সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবেন। টিটি টিকার পাঁচ ডোজ সিডিউল ঃ-

ডোজ		সময়
টিটি -	১	১৫ বৎসর বয়সে বা প্রথম গর্ভধারনের সময়
,,	২	১ মাস পর
,,	৩	পরবর্তী গর্ভাবস্থায় অথবা ২ এর ৬ মাস পর
,,	৪	পরবর্তী গর্ভাবস্থায় অথবা ৩ ,, ১ বৎসর ,,
,,	৫	পরবর্তী গর্ভাবস্থায় অথবা ৪ ,, ১ ,, ,,

গর্ভবতী এবং দুগ্ধবতী মাকে যে সকল ওষুধ দেওয়া যাবে না

মেট্রোনিডাজল , কোট্রাইমোক্সাজল,

ন্যালিডিক্সিক এসিড , ইনডোমেথাসিন,

নাইট্রোফিউরানটোইন, ক্লোরামফিনিকল,

মুখে খাওয়ার ডায়াবেটিসের ওষুধ, উচ্চমাত্রায় ভিটামিন এ ও ডি,

পেনিসিলিন, গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট,

সেলিসাইলেট, আয়োডিন ,

টেট্রাসাইক্লিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন।

এ ছাড়া উচ্চরক্তচাপের বেলায় ওষুধ সেবনে ডাক্তারের উপদেশ নিতে হবে।

শিশুদের সর্দি-কাশি ও জ্বর

শ্বাসতন্ত্রের যে কোন অংশে সংক্রমণ হলে আমরা বলব শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ।
যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় তা হলো ঃ

- সর্দি বা কাশি
- শান্ত অবস্থায় ঘন ঘন শ্বাস বা দ্রুত শ্বাস-যা শিশু নিউমোনিয়ার অন্যতম লক্ষণ।
- শ্বাস নেবার সময় বুকের নিচের অংশে ভেতরের দিকে চেপে বা ডেবে গেলে বুঝতে হবে শিশুটি মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত।
- শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের আর যে সব মারাত্মক লক্ষণ দেখা যায় তা হল ঃ
- খিচুঁনি
- অস্বাভাবিক ঘুম ঘুম ভাব বা সহজে জাগানো যায় না এমন।
- শ্বাসকষ্ট
- বুকের দুধ টানতে বা ঢোক গিলতে না পারা।

  এছাড়াও
- ছোট শিশুর জ্বর বা শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া (তাপমাত্রা কমে যাওয়া)

আপনি কি করতে পারেন ঃ

আপনি যখন আপনার শিশু অথবা আপনার এলাকার যে কোন শিশুর মধ্যে উপরের লক্ষণগুলির যে কোন ১টি লক্ষণ দেখবেন তখন আপনার এলাকার স্বাস্থ্য বা পরিবার পরিকল্পনা কর্মীকে খবর দেবেন এবং রোগীর জীবন বাঁচাতে জরুরী ভিত্তিতে রোগীকে নিকটতম হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

শিশুর অসুস্থতার সময় মা যে সমস্ত যত্ন নেবেন তা হলো ঃ

- অল্প অল্প করে স্বাভাবিক খাবার বার বার খেতে দেবেন। পানি বা তরল জাতীয় খাবার বেশী করে খাওয়াবেন।
- বুকের দুধ পান রত শিশুকে বার বার বুকের দুধ খাওয়াবেন।
- কাশির জন্য-লেবুর শরবত/অল্প অল্প গরম পানি/তুলসী পাতার রস/হালকা লিকার চা/মধু-খাওয়াতে হবে। তাতে দেখবেন শিশুর সর্দি-কাশির অনেকটা উপশম হবে এবং অল্প দিনের মধ্যেই শিশু সুস্থ হয়ে উঠবে।

● সর্দির জন্য নাক বন্ধ থাকলে নাক পরিষ্কার করে দেবেন।

শিশুর অসুস্থতার সময় মাকে নিচের লক্ষণগুলি খেয়াল রাখতে হবে এবং যে কোন ১টি লক্ষণ দেখা দেয়া মাত্র নিকটতম হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যেতে হবে ঃ

● শ্বাসকষ্ট

● দ্রুত শ্বাস

● খাওয়ার সমস্যা দেখা দিলে

● অথবা শিশু ক্রমশঃ আরো অসুস্থ হয়ে পড়লে।

কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়

● শিশুর জন্মের পর এক টানা পাঁচ মাস শুধু বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এতে শিশুর রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

● আলো বাতাসপূর্ণ ঘরে শিশুকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

● পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

● রান্নার ধোঁয়া/সিগারেটের ধোঁয়া থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে।

● হুপিং কাশি/হামের টিকা সময়মত দিতে হবে।

● আক্রান্ত শিশুকে বাঁচাতে দ্রুত রোগ নির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

● জনগণের মাঝে ব্যাপক স্বাস্থ্য শিক্ষা অভিযান চালাতে হবে। মায়েদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তাঁরা বাড়িতে শিশুর সঠিক পরিচর্যা গ্রহণে সচেষ্ট হন।

● কাশিতে আক্রান্ত শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত (ঘন ঘন) নিঃশ্বাস নিলে বুঝতে হবে শিশু ঝুঁকির সম্মুখীন, এখনই হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

শিশুর শ্বাস ঃ

৩-২ মাস-	মিনিটে	৬০	বা তারও	বেশী	
২-১২	,,	৫০	,,	,,	,,
১২ মাস - ৫ বৎসর	,,	৫০	,	,,	,,

শিশুদের খিঁচুনির কারণ

● শরীরের তাপমাত্রা বেশী হলে (১০৩° ফাঃ এর উপর)

● সংক্রমণঃ- মস্তিষ্কে ও উহার আবরণে সংক্রমণ, ম্যালেরিয়া, টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার। অন্যান্যঃ- টিকা দানের পর, ইপিলেপসি (মৃগী), শরীরে-ক্যালসিয়ামের অভাব, গ্লুকোজ এর অভাব।

শরীরে উচ্চ তাপমাত্রা ঃ- উচ্চ তাপমাত্রা থেকে বাচ্চাদের খিঁচুনি হতে পারে। উষ্ণ পানিতে কাপড় ভিজিয়ে সমস্ত শরীর মুছে দিতে হবে, পাখা চালিয়ে দিতে হবে, প্রয়োজনে হাতপাখার ব্যবস্থা করতে হবে। শরীরে যত কম কাপড় রাখা যায়, মাথায় বরফ বা ঠান্ডা পানির ব্যাগ দেওয়া যেতে পারে বা মাথায় শরীর না ভিজে মতো বার বার পানি ঢালা যাবে।

ওষুধ ঃ- মুখে প্যারাসিট্যামল জাতীয় ওষুধ খেতে না পারলে পায়খানার রাস্তায় সাপোজিটরী ব্যবহার করা যেতে পারে। খিঁচুনি হলে ডায়াজিপাম সাপোজিটরী ব্যবহার করা হবে। বাচ্চাকে প্রচুর পানি খাওয়াতে হবে কেননা ডায়রিয়ায় যেমন প্রচুর পানি শরীর থেকে বের হয়ে যায় তেমন জ্বরেও ঘাম হয়ে প্রচুর পানি শরীর থেকে বের হয়।

করণীয় ঃ-উচ্চ তাপমাত্রা থাকলে তা নামিয়ে আনতে হবে। অন্যথায় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পাঠাতে হবে।

● **তাপমাত্রার রুপান্তর সূত্র ঃ** ফারেনহিট থেকে সেন্টিগ্রেড ঃ ৩২ বিয়োগ করে

১.৮ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

সেন্টিগ্রেড থেকে ফারেনহিটঃ ১.৮ দিয়ে গুন করুন তারপর ৩২ যোগ দিন।

জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে
নিউমোনিয়া প্রতিরোধ সম্ভব।

দু' একটি জরুরী অবস্থায় কি করণীয়

কুকুর বিড়াল বা শেয়াল কামড়ালে বা আঁচড় দিলে। কাটা বা ছেঁড়া চামড়া চাটলে, লালা মুখে বা চোখে পড়লে ঃ

- ক্ষতস্থান বারবার সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
- যে প্রাণী কামড়াল সেটা আটকিয়ে রাখুন। প্রাণী ৭-১০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে নিরাপদ। অন্যথায় প্রতিষেধক ইনজেকশন দিতে হবে। কামড়ানোর পর প্রাণী যদি পালিয়ে যায় তাহলেও প্রতিষেধক দিতে হবে।

প্রতিষেধক ঃ ভেরোরেব হাতের বা উরুর মাংসে দিতে হবে। পাছায় দেওয়া যাবে না। মোট ৫ ডোজ

প্রথম ডোজ	কামড়ানোর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব	
২য় ,,	৩য়	দিন
৩য় ,,	৭ ম	,,
৪য় ,,	১৪ তম	,,
৫ম ,,	২৮ তম	,,

সাপে কামড়ালে ঃ

- রোগীকে শুইয়ে রাখুন
- কামড়ানো জায়গা নাড়বেন না
- ক্ষতস্থানে ঠান্ডা কিছু লাগাবেন না
- হাঁটুর নীচে কামড়ালে হাঁটুর উপর এবং কনুইর নীচে কামড়ালে কনুইর উপর বেঁধে রাখুন। আঙ্গুলে কামড়ালে আঙ্গুলের গোড়ায় বাঁধুন। বাঁধা এমন হতে হবে যাতে এর নীচ দিয়ে আঙ্গুল ঢুকান যায় না।
- বাঁধের নীচে পরিষ্কার ধারালো কিছু দিয়ে রক্ত ফেলে দিন।
- যাদের মুখে ঘা কিংবা ক্ষত নেই এমন লোক দিয়ে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বারবার চুষে ফেলতে হবে। তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী ডাক্তারের কাছে পাঠান।

চোখে বাইরে থেকে কোনও কিছু ঢুকে পড়লেঃ

- কিছুতেই চোখ ঘষবেন না। তাহলে ঐ জিনিসটা চোখের পর্দার ভিতর ঢুকে পড়বে।
- পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিন এবং অন্যের সাহায্য নিন যেন ঐ জিনিসটা রুমাল বা কাপড় দিয়ে বের করতে পারেন।

তামাক ও ধূমপান 'হারাম'

কারণ ঃ

১. তামাক ও ধূমপান বিষের সমতূল্যঃ

বর্তমানে এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে তামাক একটি প্রাণঘাতী বিষ। সিগারেট ও বিড়ির ধোঁয়া অসংখ্য বিষাক্ত পদার্থের সমষ্টি, যেগুলো সিগারেটের/বিড়ির তামাক পোড়ার ফলে তৈরী হয়। শরীরে এমন কোনও অঙ্গপ্রতঙ্গ নেই যেগুলো এই ধোঁয়ার বিষের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে পারে।

ধোঁয়াবিহীন তামাক যেমন সাদা, জর্দা, গুল সেবনের ফলে বিভিন্ন ধরনের গলার ক্যান্সার হতে পারে। মুখগহব্বর ও শ্বাসনালীর ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে সামান্য লক্ষণাবলীর জন্য প্রায়ই গুরুত্বসহকারে দেখা হয় না। যখন এগুলো চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে, তখন রোগের মাত্রা এতটা ছড়িয়ে যায় যে যথাযথ চিকিৎসা আর সম্ভবপর হয় না।

এ শ্রেণীর ক্যান্সার বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বেশী হয়। সেখানে ধোঁয়াবিহীন তামাকের (সাদা, জর্দা, গুল ইত্যাদি) ব্যবহার বহুলপ্রচলিত এবং এতে কোনও সামাজিক নিষেধ নেই। যেমন গুরুজনের সামনে পান, সাদা, জর্দা, গুল ব্যবহার সামাজিক দৃষ্টিতে বেয়াদবি বলে গণ্য হয় না। বরং অতিথি আপ্যায়নে এগুলোর এখনো কদর আছে।

তামাক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এ মহাসত্য এখন প্রমাণিত। তাই বলা হয় ধূমপানে বিষপান। ইসলামে বিষপান হারাম।

পবিত্র কোরানের ভাষায় ঃ

'তোমরা নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস সাধন করো না।'

২. আত্মহত্যা ও মানুষ হত্যা ঃ বিশ্বব্যাপী এখন স্বীকৃত যে তামাক হত্যাকারী। তামাক ব্যবহারের ফলে কোটি কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। কাজেই যে ব্যক্তি এই বিষ সেবন করে সে আত্মঘাতী। বাবা-মা ধূমপান করলে তা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ঘন ঘন শ্বাসরোগ সৃষ্টি করে। এতে স্থায়ী শ্বাসরোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পায় এবং শৈশব ও কৈশোরে ফুসফুসের কার্যক্রম ও বিকাশ ব্যাহত হয়।

অধূমপায়ীদের মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সার শৈশবে ও কৈশোরে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হয়ে থাকে।

পরোক্ষ ধূমপান প্রকৃতপক্ষে একধরনের অনৈচ্ছিক বা বাধ্যতামূলক ধূমপান। কারণ এক্ষেত্রে কোন অধূমপায়ী ব্যক্তি ধূমপায়ী ব্যক্তির ত্যাগকরা ধোঁয়া নিঃশ্বাসে টেনে নিতে বাধ্য হন।

একজন অধূমপায়ী ফুসফুসের ক্যান্সার রোগীর মৃত্যুর কারণ তাঁর সহকর্মীদের ধূমপান, যাঁদের সঙ্গে তিনি একই কক্ষে দিনের পর দিন কাজ করেন কিম্বা থাকেন।

আমেরিকায় বছরে ৪০০০ থেকে ৫০০০ ও যুক্তরাজ্যে প্রায় ১০০০ অধূমপায়ী মৃত্যু এরকম পরোক্ষ ধূমপানের কারণে হয়ে থাকে।

কাজেই ধূমপান আত্মহত্যা ও নরহত্যার সমতূল্য।

ইসলামে আত্মহত্যা এবং নরহত্যা হারাম।

৩. ধূমপান একটি নেশা ঃ

ধূমপান এখন নেশা বলে প্রতিষ্ঠিত। তামাকের উল্লেখযোগ্য উপাদান নিকোটিন একটি শক্তিশালী নেশা সৃষ্টিকারী। কেউ তামাক সেবন করলে ভবিষ্যতে মদ পর্যন্ত এগুবার সম্ভাবনা থাকে।

৪. ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ড ও সম্পদ নষ্ট ঃ

সারা বিশ্ব জুড়ে ধূমপানজনিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অনেক। লণ্ডনে পাতালরেলের দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে নানা অগ্নিকাণ্ডের জন্য ধূমপানের আগুনকে দায়ী করা হয়। তাই অনেকদেশের পাতালরেল এখন ধূমপানমুক্ত। বাংলাদেশের ফায়ার ব্রিগেডের হিসাব অনুযায়ী বছরে প্রায় ২ কোটি টাকার সম্পদ সিগারেট/বিড়ির আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়। এর মধ্যে গ্রামের অগ্নিকাণ্ডের হিসেব ধরা হয়নি।

কারো ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হারাম।

আল্লাহ পবিত্র কোরানে বলেন ঃ

'নিজেদের হত্যা বা ধ্বংস ক'রো না, কারণ অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের উপর পরম করুণাময়।'

৫. অর্থের অপচয় ঃ

পবিত্র কোরানে বলে অতিব্যয় অথবা অপব্যয় হারাম। তামাকের জন্য অর্থব্যয় স্পষ্টতঃই অপব্যয় এবং ইসলামে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

তামাকের পেছনে টাকা ব্যয় করতে দিয়ে গরীবের খাবারের টাকা নষ্ট করে এবং ধূমপায়ীর পরিবার অপুষ্টিতে ভোগে।

আল্লাহ বলেন ঃ

'তোমাদের সম্পদ অযৌক্তিকভাবে উড়িয়ে দিও না। অপব্যয়ীরা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ভাই।'

৬. পরিবেশদূষণ ঃ

তামাকের ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করে। এই ধোঁয়ায় অসংখ্য বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এসব পদার্থ ক্যান্সার এবং অনেক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। অধূমপায়ীদের জন্য এই ধোঁয়া ভীষণ ক্ষতিকর। পাশের কিম্বা একই কক্ষের অধূমপায়ীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এ কারণে অনেক দেশে আইন করে কর্মস্থলে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'তামাকমুক্ত কর্মস্থল' বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি শ্লোগান।

ইসলামের বিধান মতে অপরের ক্ষতি করা, পরিবেশ দূষিত করা ও স্বাস্থ্যের অনুপযোগী করা হারাম।

- ***তামাক ও ধূমপান এই দুই -ই বিষপান***
- ***আত্মহত্যার অপর নাম ধূমপান***
- ***মা বাবার ধূমপান ছেলেমেয়েদের বিষপান***
- ***গর্ভবতী মায়েরা সাবধান***
- ***পেটের সন্তানকে হত্যা করবেন না***
- ***আপনার ধূমপানে তাদের সর্বনাশ***

ডেঙ্গুঁ জ্বর

ডেঙ্গুঁ একটি মশাবাহিত ভাইরাস জনিত রোগ। এর বাহক এডিস নামক মশা। বিশ্বজুড়ে এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে বহু বছর ধরেই আমাদের দেশে অল্প হারে ডেঙ্গুঁ রোগের সংক্রমন হয়ে আসছে। সম্প্রতি এর প্রকোপ বেড়েছে।

ডেঙ্গুঁ জ্বরের এর প্রকার

উপসর্গ ছাড়া সাধারণ ডেঙ্গুঁ জ্বর সবচাইতে বেশি (এতে বিপদ নেই)

উপসর্গ সহ ডেঙ্গুঁ কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন-

ক। ডেঙ্গুঁর জ্বর (এতে বিপদ নেই)

খ। ডেঙ্গুঁ হেমোরেজিক ফিভার (এতে রোগীর নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন)

গ। ডেঙ্গুঁ শক সিনড্রোম (জরুরী টিকিৎসা প্রয়োজন)

রোগের লক্ষণঃ

ডেঙ্গুঁ সাধারণ জ্বরঃ

– হঠাৎ জ্বর ও খুব বেশি মাথা ব্যথা

– চোখে ব্যথা

– মাংসপেশী বা গিটে ব্যথা

– গায়ে লাল লাল দানা (র‌্যাশ)

ডেঙ্গুঁ হেমোরেজিক (রক্তক্ষরণজনিত) ফিভার ঃ

– চামড়ার নিচে বিন্দু বিন্দু/ছোপ ছোপ রক্ত

– মাড়ি/নাক দিয়ে রক্ত পড়া

– রক্ত বমি/কালো আলকাতরার মত পায় খানা

– রক্তে অনুচক্রিকা (Platelet) কমে যাওয়া (এক লাখের নিচে)

– বুকে বা পেটে পানি আসতে পারে

ডেঙ্গুঁ শক সিনড্রোম ঃ

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলোর সঙ্গে

– হাত পা শীতল হওয়া

– রক্তচাপ হঠাৎ কমে যাওয়া

– রোগীর অস্থিরতা বা ছটফট করা

রোগ নির্ণয়

রোগ নির্ণয় মূলত ঃ উপসর্গ ও শারীরিক লক্ষণ নির্ভর।

ল্যাবরেটরীর ভূমিকা গোন, তবে রোগের জটিলতা নিরূপনে রক্তে অনুচক্রিকা গণনা গরুত্বপূর্ণ।

এন্টিবডি টেস্ট

রোগ নির্ণয়ে এন্টিবডি টেস্ট অপরিহার্য নয়। ডেঙ্গুঁ চিকিৎসায় এর ভূমিকা নেই। ডেঙ্গুঁ ছাড়াও যেমন এন্টিবডি পজিটিভ হতে পারে তেমন ডেঙ্গুঁ হয়েও টেস্ট নেগেটিভ হতে পারে। শুধুমাত্র প্রাদুর্ভাব পর্যবেক্ষণের জন্যই এই টেস্ট করা যেতে পারে। আশে পাশে ডেঙ্গুঁ হয়েছে জানলে জ্বর, যদি শরীরে ব্যথা হয় ও কিছু লাল দানা দেখা দেয়। তবে ডেঙ্গুঁ মনে করা উচিত এবং নিকটস্থ্ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

যে সব জ্বর ডেঙ্গুঁ নয়

– জ্বরের সাথে যদি সর্দি, গলা ব্যথা ও কাশি থাকে

– জ্বর যদি ১৪ দিনেরও বেশী থাকে

চিকিৎসা

উপসর্গ মতে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল ও বেশি করে পানীয় গ্রহণ করা উচিত

বেশির ভাগ রোগী এই ব্যবস্থাপনায় সেরে ওঠে যদি না কোন জটিলতা দেখা দেয়।

জটিলতার নিদর্শন

মারাত্মক রক্তক্ষরণ (Major bleeding)

– রক্ত বমি/পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া

– নাক/মাড়ি দিয়ে রক্তক্ষরণ

রক্তচাপ কমে যাওয়া

– হাত-পা শীতল হওয়া

– নাড়ির দ্রুতগতি

– অস্থিরতা

– প্রচন্ড পেটে ব্যথা

– পেট ফুলে যাওয়া বা শ্বাসকষ্ট হওয়া

কখন হাসপাতালে ভর্তি হবেন

– উল্লেখযোগ্য রক্তক্ষরণ

– হঠাৎ রক্তচাপ কমে যাওয়া

– প্রচন্ড পেটে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট

ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুয়িড-এর ব্যবহার

– হঠাৎ রক্তচাপ কমলে

– হেমাটোক্রিট শতকরা ২০ ভাগ বাড়লে এবং মুখে পর্যাপ্ত পানি গ্রহণ সম্ভব না হলে

রক্তের প্রয়োজনীয়তা

– রক্তক্ষরণজনিত কারণে রক্তচাপ কমে গেলে। তবে সাধারণতঃ প্লাজমা লিকের রক্তচাপ কমে এবং সেক্ষেত্রে ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুয়িড যথেষ্ট।

অনুচক্রিকার প্রয়োজনীয়তা

– সংখ্যা ১০,০০০ এর নীচে নেমে আসলে

যে সব চিকিৎসার ভূমিকা স্বীকৃত নয়

– এন্টিবায়োটিক

– স্টেরয়েড

– এন্টি ভাইরাস

যে সব ঔষধ নিষিদ্ধ

– এসপিরিন

– প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য সব জ্বর ও ব্যথার ঔষধ

প্রতিরোধ

ডেঙ্গুঁর কোন টিকা নাই। মশা নিধন উত্তম এবং অপরিহার্য। এটা করতে হলে যে সমস্ত জায়গায় মশা থাকে সেই গুলোকে নষ্ট করতে হবে যেমন- জমা পানি, পানিযুক্ত পাত্র, টায়ার, পলিথিন নর্দমা, জমাট ময়লা ইত্যাদি পরিস্কার করতে হবে। এ ছাড়া মশারী ব্যবহার করা উত্তম।

সূত্রঃ- প্রফেসর তোফায়েল আহামেদ
এমবিবিএস, এফসিপিএস, এমআরসিপি, এফআরসিপি, এফএসিপি
প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল

রোগ/লক্ষণ নির্দেশিকা

রোগ লক্ষণ	পৃষ্ঠা	রোগ লক্ষণ	পৃষ্ঠা
অবসন্নতা	৬১	গায়ে ব্যথা	৮
অগ্নিদগ্ধ হওয়া	৮৩	ঘা পাঁচড়া	১৬,২১,২৭
অসটিও আর্থোসিস	৯	ঘুম কম হওয়া	৭৪
অন্ধত্ব	৬৪	চোখ থেকে পানি পড়া	৬৬
অনৈচ্ছিক ধূমপান	১৩৩	চোখে আঘাত	৬৬
আমাশয়	২১,২৭,৭৯	চোখের সংক্রমণ	৬৬
আয়রনের অভাব	৬১	চোখ লাল হওয়া বা উঠা	৬৬
আই ভি স্যালাইন	৮২	চাবুক কৃমি	৫০
আত্মহত্যা	১৩৩	জ্বর	৮,৯
এন্টিবায়োটিক	১৫	জরায়ুর সংক্রমণ	২১,২৭
এলার্জি	৪৪	ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভ	১৪৪
কিডনি	৭৯	টাইফয়েড	২১
কৃমি	৪৮,৪৯,৫০,৫১	টনসিলেন প্রদাহ	১৬,২১
কেঁচোকৃমি	৪৯	টক ঢেকুর	৬৮
কলেরা	২৭,৭৯	ডিপথেরিয়া	১৮
কাঁটা ঘা	১৫	ডায়রিয়া	৭৯,৮২
ক্লান্তি	৬১	ডেঙ্গুঁ	১৫৩
কনজাংটিভাইটিস	৬৬	দুশ্চিন্তা	৭৪
কান পাকা	৬৬	দাঁতে ব্যথা	৯
কানের সংক্রমণ	৬৬	ধনুষ্টংকার	১৪৫
কোলেস্টেরল	৯৫	ধোয়াবিহীন তামাক	১৩২
কুষ্ঠ	১১১	নাক বন্ধ	৩৯
ক্ষত	১৬	নখ পাতলা ও চেপ্টা	৬১
খাবার স্যালাইন	৭৯,৮০	নিওমোনিয়া	১৬,২১,২৭
খিঁচুনি	৭৪	নিকোটিন	১৫০

রোগ লক্ষণ	পৃষ্ঠা
পিত্তথলির ব্যথা	৭১
পাকস্থলির ব্যথা	৭১
পেপটিক আলসার	৬৮
পেটফাঁপা	৬৮
পাতলা পায়খানা	৮৪
পুঁজ পড়া	১৬
প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ	৫৮
পুষ্টিহীনতা	৬৪
পায়ে পানি/ফুলা	৭৬,৭৭
প্রশ্রাব কম হওয়া	৭৬
ফুসফুসে পানি	৭৮
ব্যথা	৮,৯,৭৪
বাতের ব্যথা	৯
বাতজ্বর	৯,১৬
বক্রকৃমি	৪৮
বমি	৭৯,৮২
ব্রংকাইটিস	৪০
বুকে ব্যথা	৪০
বেনজামিন পেনিসিলিন	১২৩
ভ্রমকালীন বমি	৪৫
মাথা ব্যথা	৮
মাসিকের ব্যথা	৯
ম্যালেরিয়	৩৪,৩৬
হৃদপিণ্ডের সংক্রমণ	১৯

রোগ লক্ষণ	পৃষ্ঠা
পেটের ব্যথা	৭১
মসৃন জিহবা	৬১
মুত্রাশয় ও মুত্রনালীর সংক্রমণ	১৬,২৭
সর্দি-কাঁশি	১৬,২১
মেনিনজাইটিস	১৮
যন্ত্রণা	৭৪
রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস	৯
রক্তবমি	১০
রক্ত আমাশয়	৭৭
রক্তক্ষরণ	৮৩
রক্তশুন্যতা	৬০
রাতকানা	৬৩
শ্বাসকষ্ট	৪০,৭৭,৩৭
শ্বাসটান	৪০
শোত	৭৬
শরীরে পানি ও ফুলা	৭৬
শরীর চুলকান	৪৫
সাদা স্রাব	৩২
স্যালাইন	৭৯,৮০,৮১
সর্দিজ্বর	৮
সুতাকৃমি	৪৯
হায়াটাস হার্নিয়া	৬৯
হাঁপানী	৩৭,৪০
হাইডাটিড	৫১

DRUG TREATMENT OF UNCOMPLICATED MALARIA IN ADULTS

Box 4.13 Durg treatment of uncomplicated malarial in adults

Type of malaria	Drug treatment
Plasmodium vivas, P. ovale, P. malariae	Cloroquine: 600mg 300 mg 6 hours later 300 mg 24 hours later 300 mg 24 hours later
P. falciparum (almost all are resistant to chloroquine)	Quinine : 600 mg 3 times daily for 7 days plus Doxycycline: 200 mx × 1 daily for 7 days Or Fansidar (SP): 3 tablets as single dose Alternative therapies Artesunate-mefloquine 12/25 mg/kg daily for 3 days Or Dihydroartemisinin/piperaquine 6.3 mg/kg daily for 3 days Or Malarone: 4 tablets daiyl for 3 days Or Coartemether/Riamet: 4 tablets 12 hourly for 3 days Or Lapdap (chlorproguanil/dapsone)

SP, Fansidar = pyrimethamine/sulfadoxine; Malarone=atovaquone/ proguanil; Coartemether/ Riamet=artemether lamufantrine.

Chloroquine doses quoted are for base drug.

Quinine dose applies to sulphate, hydrochloride or dihydrochloride.

MALARIA PROPHYLAXIS FOR ADULT TRAVELLERS

Box 4.14 Malaria prophylaxis for adult travellers

Area visited	Prophylactic regimen	Alternative
No chloroquine resistance	Chloroquine 300 mg weekly	Proguanil 200 mg daily
Limited chloroquine resistance	Chloroquine 300 mg weekly plus Proguanil 200 mg daily	Doxycycline 100 mg daily Or Malarone 1 tablet daily Or Mefloquine 250 mg weekly
Significant chloroquine resistance	Mefloquine 250 mg weekly	Doxycycline 100 mg daily Or Malarone 1 tablet daily

Recommended regimens for Helicobacter pylori eradication in adults one week

Acid suppressant	Amoxicillin	Clarithromycin	Metronidazole
Esorneorazole 20mg twice daily	1 g twice daily	500 mg twice daily 250 mg twice daily	400 mg twice daily
Lansoprazole 30mg twice daily	1 g twice daily 1 g twice daily	500 mg twice daily 250 mg twice daily	400 mg twice daily 250 mg twice daily
Omeprazole 20mg twice daily	1 g twice daily 500 mg 3 time daily	500 mg twice daily 250 mg twice daily	400 mg 3 times daily 400 mg twice daily
pantoprazole 40mg tiwce daily	1 g twice daily	500 mg twice daily 250 mg twice daily	400 mg twice daily
Rabeprazole 20mg twice daily	1 g twice daily	500 mg twice daily 250 mg twice daily	400 mg twice daily

Pharmacological therapy in

Acute Coronary Syndromes

Drug	Dose	Notes
General myocardial oxygena'iun Oxygen	35-50%	Check ABG in severe COPD
Antiplatelet Aspirin	150-300mg chewable or soluble aspirin, then Give PPI with dyspepsia history 75-100 mg p.o. daily	
Clopidogrel	300 mg p.o. loading dose, then 75 mg p.o. daily	Caution - increased risk of bleeding, avoid if CABG planned
Analgesia Diamorphine	2.5-5.0 mg i.v.	Prescribe with antiemetic, metoclopramide 10 mg i.v.
Myocardial energy consumption *13 blockers*	*e.g. Atenolol 5 mg i.v, repeated after 15 min, Avoid in asthma, heart failure, hypotension,*	
	then 25-50 mg p.o. daily	bradyarrhythmias
	or Metoprolol 5 mg i.v. repeated to a maximum	
		Avoid in asthma, heart failure, hypotension,
	of 15 mg, then 25-50 mg p.o. twice daily	bradyarrhythmias
Coronary vasodilatation		
Glyceryl trinitrate	2-10 mg/h i.v./buccal/or sublingual	
Plaque stabilization/ventricular remodelling		

HMG-CoA reductase inhibitors (statins)	e.g. Simvastatin 20-40 mg p.o. daily Pravastatin 20-40 mg p.o. daily Atorvastatin 80 mg p.o. daily
ACE inhibitors	e.g. Ramipril 2.5-10 mg p.o. daily Lisinopril 5-10 mg p.o. daily

Maintain systolic BP above 90 mmHg

Combine with dietary advice and modification

Monitor renal function

Plus for non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI)

Antithrombin

Low-molecular-weight Enoxaparin 1 mg/kg s.c, twice daily heparins

Glycoprotein 1113/111A inhibitors

Abciximab	0.25 mg/kg i.v, bolus, then 0.125 mg/kg/minIf coronary intervention likely within 24h up to 10 mg/min i.v. for 12h	
Eptifibatide	180 mg/kg i.v. bolus, then 2 mg/kg/min i.v. for 72 h	indicated in high-risk patients managed without coronary intervention or during PCI
T jrofi ban	0.4 mg/kg/min i.v. for 30 min. then 0.1 mg/kg/min for 48-108 h	Indicated in high-risk patients managed without coronary intervention or during PCI

Plus for ST-elevation myocardial infarction (STEMI)

Thrombolysis

Streptokinase	1 500 000 units i.v. over 60 min	Antibodies appear after 4 days, which reduces effectiveness
(Dr Alteplase (rt-PA)	15 mg i.v. bolus, then 50 mg over 30 min	Dose modification if < 65 kg or 6-12 h post-MI
or	and 35 mg over 60 min	Prescribe LMW heparin i.v. for 48 h
Tenecteplase (TNKase) 30-50 mg i.v. bolus according to weight		Prescribe LMW heparin i.v. for 48 h or enoxaparin
or Reteplase	10 units i.v. bolus repeated after 30 min	1 mg/kg twice daily Prescribe LMW heparin i.v, for 48 h

ABG, arterialiblood gases; CABG, coronar' artery bypass grafting; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; PCI, percutaneous coronary intervention; PPI, proton pump inhibitor

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যার সম্বন্ধে

সবকটি তালিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিজ্ঞানের প্রাক্তন পরিচালক শাহ মোহাম্মদ অধ্যাপক কেরামত আলী হতে প্রাপ্ত।

লেখক

জাতীয় অধ্যাপক

ডা. নুরুল ইসলাম

বিভিন্ন ধরণের খাবার

যারা ওজন কমাতে চান তাদের খাবার

ওজনাধিক্য বা মোটা হওয়ার প্রধান কারণ হলো প্রতিদিন প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পরিমাণে খাবার গ্রহণ করা। প্রতিদিন ১০০কিলো ক্যালরী বেশী খাওয়া হয় তাহলে মাসে ৩০০০ কিলোক্যালরী দেহে সঞ্চিত হয় যা ওজন বৃদ্ধি করবে ১ পাউন্ড। এভাবে চলতে থাকলে বছরে ১২ পাউন্ড ওজন বাড়বে। খাবার ছাড়াও জীবনে যাত্রার অভ্যাস, পারিবারিক খাবার গ্রহণের রীতি, অপর্যাপ্ত পরিশ্রম, বংশগত ইত্যাদি কারণে শরীরের ওজন বেড়ে যেতে পারে। যেহেতু অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ থেকেই শরীরে মেদ জমে সেজন্য ওজন কমাতে হলে কম ক্যালরী যুক্ত খাবার খেতে হবে যাতে শরীরে শক্তির প্রয়োজনে নিজের সঞ্চিত ফ্যাট ভেঙ্গে শক্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং ওহন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কিছুকিছু খাবার বর্জন বা পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে।

বর্জনীয় খাবার :

১. সরবত সহ সব ধরনের মিষ্টি পানীয় (কোক, পেপসি, জুস, চকোলেট মিল্ট)
২. খাসীর মাংস, কলিজা, মগজ, মুরগীর চামড়া।
৩. মিষ্টি ও মিষ্টি জাতীয় সব ধরনের খাবার।
৪. তেলে ভাজা খাবার যেমন পরোটা, সমোচা, সিংগারা, ডালপুরি, আলুপুরি ইত্যাদি।
৫. ঘি, মাখন ও মেয়োনেজ দিয়ে তৈরী খাবার
৬. বড় তৈলাক্ত মাছ
৭. আইসক্রিম, ফাষ্টফুড, চকোলেট, চীপস, কেক

অল্প পরিমানে গ্রহণযোগ্য খাবারঃ

১. ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি
২. আলু, কাঁচাকলা, কচু
৩. চর্বিবহুল মাছ, মাংস
৪. কলা, কাঁঠাল, আম
৫. চর্বিযুক্ত দুধ (ঘন দুধ, দুধের সর)

ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে

১. সব ধরনের শাক এবং সালাদ
২. সবজি (উল্লেখিত সবজি ব্যতিত)
৩. টক জাতীয় ফল যেমন আমড়া, আমলকি, কামরাঙ্গা, জাম, জামবুরা, জামরুল, ডাব, বাঙ্গি ইত্যাদি।

নিম্নে কম ক্যালরীযুক্ত খাবারের একটি তালিকা দেয়া হলোঃ

ক্যালরী-১২০০কি. ক্যালরী
প্রোটিন-৫৪গ্রাম
ফ্যাট-২৭গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট-১৭৫ গ্রাম

সকালের নাস্তাঃ

রুটি-২টি (প্রতিটি ৩০ গ্রাম ওজনের অর্থাৎ মাঝারি আকারের)

ডিম-১টা/ ডাল- $\frac{১}{২}$ কাপ

সবজি- $\frac{১}{২}$ কাপ

ফল-১টা (টক জাতীয়)।

নাস্তাঃ

বিস্টিক-১পিস

আপেল-১টা (৪০গ্রাম ওজনের)

দুপুরের খাবার ঃ

ভাত-২কাপ

মাছ/মাংস-৩০গ্রাম/১টুকরা (দেড় ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি)

সবজি-১কাপ

শাক- $\frac{১}{২}$ কাপ

ডাল- $\frac{১}{২}$ কাপ

নাস্তাঃ

দুধ-১কাপ (১২০ মি.লি.)

রাতের খাবার ঃ

ভাত-১কাপ /রুটি-২টি

মুরগী-৩০ গ্রাম

সবজি-১কাপ

ডাল-$\frac{১}{২}$ কাপ

প্রতিদিন পরিমিত পরিমানে খাবার গ্রহণের সাথে ৪৫মি. করে নিদিষ্ট সময়ে হাঁটতে হবে। এতে শরীরের অতিরিক্ত ওজন আস্তে-আস্তে কমে বাঞ্ছিত ওজনে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

যারা ওজন বাড়াতে চান তাদের খাবার

কৃশ ব্যক্তির ওজন স্বাভাবিক ওজন অপেক্ষা অনেক কম থাকতে পারে। তাঁরা স্বভাবতই সব সময়ে দুর্বল বোধ করেন এবং সহজ জীবন যাপন থেকে নানাভাবে বঞ্চিত হন। বয়স ওউচ্চতা অণুযায়ী শরীরের ওজন আদর্শ ওজন অপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ কম হলেই তাকে কৃশ বলা হয়। দেহ কৃশ বা ক্ষীণ হলে তাদের খাদ্য তালিকা এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যেন দেহের ক্যালরীর চাহিদা মিটিয়ে কিছু ক্যালরী অতিরিক্ত জমা থাকে। তবে হঠাৎ করে বেশী খাবার খেলে হজম প্রক্রিয়ায় সমস্যা হতে পারে। সেজন্য প্রতিদিন অল্প অল্প করে বাড়তি খাদ্য দিয়ে শরীরকে অভ্যস্ত করতে হবে। এভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশী ক্যালরীযুক্ত খাবার খাওয়া সম্ভব হবে।

নিম্নে বেশী ক্যালরী যুক্ত ও ওজন বৃদ্ধিকারী খাবার তালিকা দেয়া হলো–

ক্যালরী-৩০০০কি. ক্যালরী

প্রোটিন-১২১ গ্রাম

ফ্যাট-৯৯ গ্রাম

কার্বোহাইড্রেট-৪২১গ্রাম

সকালের নাস্তাঃ

রুটি-৫টি (প্রতিটি ৩০গ্রাম ওজনের)

সবজি-১ $\frac{১}{২}$ কাপ

ফল-১টা

ডিম-১টা/ডাল- $\frac{১}{২}$ কাপ

নাস্তাঃ

বিস্কিট-২ পিস

ফল-১টা

দুপুরের খাবারঃ

ভাত -৬কাপ

মাছ-২পিস

ডাল-৩কাপ

শাক- $\frac{১}{২}$ কাপ

সবজি-১ $\frac{১}{২}$ কাপ।

নাস্তাঃ

দুধ-১গ্লাস

রাতের খাবারঃ

ভাত-২ $\frac{১}{২}$ কাপ

মুরগী-২টুকরা

ডাল-২কাপ

সবজি-১কাপ

রান্নার জন্য তেল-৫০গ্রাম

অনেক সময় বিভিন্ন অসুস্থতার জন্য কোন নিদিষ্ট খাবার গ্রহণ বা বাদ দিতে বলা হয় এধরণের কয়েকটি নমুনা এবারে আলোচনা করা হলো।

ডায়াবেটিস রোগীর খাবার

ডায়াবেটিস হলে রক্তে শর্করা বা গ্লুকোজ এর পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায় এবং সেই সাথে প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করা নির্গত হতে থাকে। ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে শরীরে শর্করা , প্রোটিন ও ফ্যাট জাতীয় খাবারের বিপাক টিক মতো হয় না। আর এর ফলেই রক্তে শর্ককরা পরিমাণ বেড়ে যায়। শরীরের এই অবস্থায় ওষুধের পাশাপাশি খাবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত হাঁটা , ব্যায়াম ও পরিমিত পরিমানে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

একজন ডায়াবেটিক রোগী কি ধরণের খাবার খেতে পারে তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো-

ডায়বেটিক রোগীর ১দিনের খাবার:

ক্যালরী-১৮০০

প্রোটিন-৬৮গ্রাম

ফ্যাট-৫৭গ্রাম

কার্বোহাইড্রেট-২৪৫গ্রাম

সকালের নাস্তাঃ

রুটি-২টি (প্রতিটি ৩০ গ্রাম ওজনের)

ডিম-১টা/ডাল-$\frac{১}{২}$ কাপ (ঘন)

সবজি-১কাপ

টক জাতীয় ফল-১টা

নাস্তাঃ

বিস্কিট -২পিস (নোনতা)

ফল-১টা (টক জাতীয়)

দুপুরের খাবার ঃ

ভাত ৩$\frac{১}{২}$ কাপ

মাছ-৩০গ্রাম/১টুকরা

ডাল-১ $\frac{১}{২}$ কাপ

শাক- $\frac{১}{২}$ কাপ

সবজি-১ $\frac{১}{২}$ কাপ

নাস্তাঃ

দুধ-১কাপ

রাতের খাবার ঃ

রুটি-৩টি (প্রতিটি ৩০ গ্রাম ওজনের)

মুরগী-১টুকরা

ডাল-১কাপ

সবজি-১কাপ

রান্নার জন্য তেল-২৫গ্রাম

নিষিদ্ধ খাবারঃ

১. মিষ্টিও মিষ্টি জাতীয় খবার
২. আইসক্রিম , চকোলেট
৩. সরবত সহ সব ধরনের ড্রিংকস (কোক, পেপসি ইত্যাদি)
৪. বেকারী খাবার , তেরে ভাজা খাবার
৫. চর্বিযুক্ত মাংস, কলিজা, মগজ
৬. ঘি, মাখন, ডালডা, মেয়োনেজ

কম খাওয়া যাবে অর্থাৎ সীমিত পরিমানে গ্রহণযোগ্য খাবারঃ

১. ভাত, রুটি চিড়া, মুড়ি
২. আলু, কাঁচাকলা, সীম, সীমের বীচি, মিষ্টিকুমড়া, গাজর, মটরশুটি, বীট, কাঁকরোল, ঢ্যাড়ষ, বরবটি।
৩. আম, আপেল, আ্নারস, আঙ্গুর, কলা, কাঁঠাল কমলা, মাল্টা, পাকা পেয়ারা, লিচু, তরমুজ ইত্যাদি মিষ্টি জাতীয় ফল।
৪. পোলাও , বিরিয়ানী, খিচুড়ী।

ইচ্ছামতো খাওয়া যাবে

সব ধরনের শাক এবং সালাদ

সবজিঃ কাঁচাপেঁপে, চাল কুমড়া, লাউ, পটল, ঝিংগা, চিচিংগা, ধুন্দল, ফুলকপি, বাধাকপি, শসা, টমোটো, করল্লা, সাজনা, ডাটা ,বেগুন্

সব ধরনের টক জাতীয় ফল-আমড়া, আমলকি, জাম , জামবুরা, জামরুল, বাঙ্গি, ডাব, কামরাঙ্গা।

ডায়বেটিস রোগীদের জন্য পরিমিত পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণই রোগ নিয়ন্ত্রেণের প্রধান উপায়। রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে রোগী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অনিয়ন্ত্রিত ডায়বেটিসে কিডনীও হাঁর্টের সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও দীর্ঘ মেয়াদী রোগে চোখে ছানি পড়েগ, দেহের কোন ক্ষত স্থানে ঘা হলে তা সহজে শুকাতে চায় না, ফলে গ্যাংগ্রীন হতে পারে। শরীরের এই ধরণের অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অবশ্যই নিয়ম মেনে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

হৃদরোগের খাবার তালিকা

রক্তে ফ্যাট বা স্নেহের পরিমাণ বিশেষ করে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা দেখা দেয় স্থূলতা, ডায়াবেটিস, বেশী পরিমানে খাদ্যগ্রহণ , বংশগত, ধুমপান ইত্যাদি কারণে হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ হতে পারে। হৃদরোগ প্রতিরোধ করা যায়, তবে সম্পূণ্রূপে নিরাময় করা যায় না। সঠিক ও পরিমিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ , অতিভোজন থেকে বিরত থাকা, অতিরিক্ত দুশ্চিতা, না করা, পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম এবং সুস্থ জীবন যাপন করলে যাপন করলে হৃদরোগ ও উচ্চরক্তচাপ রোগ হতে মুক্ত থাকা যায়।

নিম্নে একজন হৃদরোগীর ১দিনের খাবার তালিকা দেয়া হলো।

ক্যালরী-১৪০০কি. ক্যালরী

প্রোটিন-৬০গ্রাম

ফ্যাট-৩৮ গ্রাম

কার্বোহাইড্রেট-২১৫গ্রম

সকালের নাস্তাঃ

আটার রুটি-২টি

ডাল-$\frac{১}{২}$ কাপ/ডিমের সাদা অংশ -১টা

সবজি-১কাপ

টক জাতীয় ফল-১টা

নাস্তাঃ

বিস্কিট-২টা

ফল-১টা (মিষ্টি জাতীয়)

দুপুরের খাবারঃ

ভাত-৩ কাপ

মাছ-১টুকরা/৩০ গ্রাম

ডাল-১কাপ

সবজি-১কাপ

শাক-$\frac{১}{২}$ কাপ

নাস্তাঃ

দুধ-১কাপ (সর তোলা)

রাতের খাবারঃ

ভাত-১কাপ/রুটি-২টি

মুরগীর মাংস-১টুকরা

ডাল-১ কাপ

সবজি-১ কাপ

রান্নার জন্য তেল -২০গ্রাম

হৃদরোগের যে সকল খাবার গ্রহণ ও বর্জন করতে হয় তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো-

বর্জিত খাদ্য/ যা খাওয়া যাবে না	গ্রহণযোগ্য খাদ্য/ যা খাওয়া যাবে
১। তেলে ভাজা খাবার পরোটা, লুচি, চিপস, ডালপুরি, আলুপুরি, সমোচা, সিংগারা ইত্যাদি।	১। শাক-সবজি গাজর , মিষ্টিকুমড়া, টক জাতীয় ফল, মিষ্টি জাতীয় ফল।
২। গরুর মাংস, খাসীর মাংস, কলিজা, মগজ, মুরগীর চামড়া	২। মুরগীর মাংস, মাছ
৩। ডিমের কুসুম	৩। ডিমের সাদা অংশ
৪। দুধের সর, আইসক্রিম,ঘন দুধের পায়েস, বিভিন্ন ধরণের মিষ্টি।	৪। লবন ছাড়া পনির টক দই।
৫। ঘি, মাখন, মেয়োনেজ, ডালডা	উদ্ভিজতেল্‌ সয়াবিন, সূর্যমুখী তেল
৬। গুড়, চিনি, হালুয়া	৬। মধু (পরিমিত পরিমানে)
৭। বিরিয়ানী, পোলাও খিচুড়ী	৭। ভাত (পরিমিত পরিমানে)
৮। আইসক্রিম, চকোলেট, ফাস্টফুড	৮। ননী তোলা দুধ
৯। পটেটো ক্র্যাকার্স, বিভিন্ন ধরনের চিপসও টিনজাত খাবার ।	৯। ভুট্টার খই।

ব্ল্যাড পেসার বা উচ্চ রক্তচাপ রোগীর খাবার তালিকা

উচ্চ রক্তচাপ বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন হৃদরোগ, কিডনী রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি। এছাড়া অনিয়মিত জীবন যাপন যেমন–অত্যাধিক ধুমপান , ওজনাধিক্য এবং বংশগত প্রভাবেও উচচরক্তচাপ রোগের সম্ভাবনা বাড়ে। সেজন্য প্রতিদিনের খাবার মোট ক্যালরীও স্নেহজাতীয় খাবার ও লবনের পরিমাণ কমাতে হবে। নিম্নে উচ্চরক্তচাপ রোগীর ১দিনের খাদ্য তালিকা দেয়া হলো।

ক্যালরী-১০০০কি. ক্যালরী

সোডিয়াম-৪০০মিলি গ্রাম

প্রোটিন-৭০ গ্রাম

সকালের খাবারঃ

আটার রুটি -২টি (লবন ছাড়া)

ডিম (সাদা অংশ) -১টা

সবজি- $\frac{১}{২}$ কাপ

ফল-১টা

নাস্তাঃ

ফল-১টা

দুপুরের খাবারঃ

ভাত-১কাপ

মাছ/ মুরগীর মাংস-২টুকরা

শাক-১কাপ (পাতলা)

সবজি-১ কাপ

নাস্তাঃ

দুধ -১গ্লাস (সরতোলা)

রাতের খাবার ঃ

ভাত -১ কাপ/ আটার রুটি-২টি

মাছ/মুরগীর মাংশ-২ টুকরা

সবজি-১কাপ

রান্নার জন্য তেল-৩চা চামচ (১৫গ্রাম)

উচ্চরক্তচাপ রোগীর যদি ওজন বেশী থাকে তবে উপরে উল্লেখিত পরিমাণ খাবার খেয়ে বাঞ্ছিত ওজনে আসা সম্ভব। ওজন কিছুটা কমে আসলে হার্ট এর কাজ সহজসাধ্য হয়। এছাড়া প্রতিদিনের খাবার মোট ক্যালরীও সোডিয়াম বা লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। তাই যে সব খাবার সোডিয়াম বেশী এবং কম রয়েছে সেগুলো এখানে বর্ণনা করা হলো।

বেশী সোডিয়াম যুক্ত খাবার ঃ

গরুর মাংস, গুরুর কলিজা, নোনতা খাবার , পনির, চিপস, টিনজাত খাবার , আচার , চাটনী, জলপাই, মুড়ি, বেকিং পাউডার, চকোলেট, পাউরুটি, কেক, ডিম, দুধ, শস্য খাদ্য, বাদাম, ডাল ইত্যাদি।

কম সোডিয়াম যুক্ত খাবারঃ

ঝিংড়া , ঢেঁড়ষ, টমেটো, বেগুন, চালকুমড়া, শসা, বিভিন্ন ধরণের ফল,. সুজি, তেল, আলূ, চিনি, মধু ইত্যাদি।

উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে খাওয়ার লবন ও যে সব খাদ্যে সোডিয়াম বেশী পরিমাণে আছে সেগুলো বাদ দিতে হবে। উচ্চরক্তচাপ রোগী ধুমপান ও মদ্যপান না করে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেন।

কিডনী রোগীর জন্য ৩০ গ্রাম প্রোটিন যুক্ত খাবারের তালিকাঃ

একজন কিডনী রোগী ৩০ গ্রাম প্রোটিন যুক্ত খাবারের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো

ক্যালরী-১৮০০কি. ক্যালরী

প্রোটিন-৩১-৩২গ্রাম

সোডিয়াম-১৮০কি. গ্রাম

পটাসিয়াম-১২০০ মি. গ্রাম

সকালের নাস্তাঃ

রুটি-১টা

দুধ-১০০মি.লি.

সবজি-১কাপ

নাস্তাঃ

বিস্কিট-২টি

দুপুরের খাবারঃ

ভাত-১$\frac{১}{২}$কাপ

ডিম-১টা

সবজি-১কাপ

নাস্তাঃ

দুধ-১০০মি.লি

বিস্কিট-২পিস

রাতের খাবার ঃ

ভাত-১$\frac{১}{২}$কাপ

সবজি-১কাপ

দই-১০০মি.লি

যেসব রোগীকে ৩০ গ্রাম প্রোটিন খাওয়ার জন্য চিকিৎসকগণ পরামর্শ দেন তারা প্রতিদিন নিম্নলিখিত পরিমাণ খাবার খেতে পারেন।

দুধ-২০০মি. লি

দই-১০০মি.লি

ডিম-১টা

ভাত-২০০গ্রাম বা রুটি -৬টা

সবজি -২০০গ্রাম বা রুটি -৬টা

সবজি-২০০গ্রাম

সাগু-১০০গ্রাম

চিনি-৭৫গ্রাম

সয়ানিবন তেল-৪০গ্রাম।

এইসাথে যাদের পটাশিয়াম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় তাদের জন্য সবজি রান্নার আগে ছোট ছোট করে কেটে বার বার ধুতে হবে। এরপর সবজি পানিতে দেওয়ার পর ফুটে উঠলে পানি ফেলে দিয়ে তারপর প্রয়োজনীয় মশলা ও তেল দিয়ে রান্না করতে হবে। এভাবে রান্না করা সবজিতে পটাশিয়ামের পরিমাণ খুব কম থাকে।

ডায়াবেটিস থেকে কিডনি ফেইল্যুর

.... এবং চিকিৎসা

প্রফেসর (ডাঃ) এম এ সামাদ

শামিম আরা টলি। ৭৩-৭৫ সালের ট্র্যাকের দুর্দান্ত দ্রুততম মানবী। ডায়াবেটিসজনিত কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে দুটি কিডনি হারিয়েছেন। পৃথিবীর আলো দেখার জন্য এখন তাঁকে সপ্তাহে ৩বার ডায়ালাইসিস করতে হয়। ল্যাব এইড ডায়ালাইসিস ইউনিট এ্ই ব্যয়বহুল চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে। শামিম আরা টলি প্রথমে বুঝতেই পারেননি তাঁর কিডনি আক্রান্ত হয়েছে। আর যখন বুঝতে পেরেছেন, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাই ট্র্যাক বিজয়ী টলি আজ ডায়াবেটিস থেকে কিডনি ফেইল্যুর-এর কাছে প্ররাস্ত।

ডায়াবেটিসজনিত কিডনি রোগ, ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথি কি , কিভাবে এটি প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় করা যায় কি উপায়ে এ ঘাতক ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা নিয়ে আজকের আলোচনা।

প্রথমেই বলে নিচ্ছি, আমাদের দেহে দুটি কিডনি আছে। প্রতিটি কিডনিতে প্রায় বার লক্ষ (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীর তৈরি) ছাঁকনি থাকে। যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তনালীল সমন্বেয়ে তৈরি। এই ছাঁকনি আমাদের দেহের সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ ও অতিরিক্ত পানি প্রস্রাব আকারে বের করে দেয়। পাশাপাশি রক্তে প্রয়োজনীয় পদার্থ ধরে রাখে। কোন কারণে এই ছাঁকনি বিকল হলে দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ রোগীকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দ্বারে নিয়ে যায়। এ অবস্থাকেই বলে কিডনি ফেইল্যুর ।

ডায়াবেটিস থেকে কিডনি কিভাবে আক্রান্ত হয়

রক্তে উচচ্ মাত্রায় শর্করা বা সুগার ধীরে ধীরে কিডনির ২৪লক্ষ ছাঁকনি নষ্ট করে দেয়। প্রাথমি পর্যায়ে প্রস্রবের সাথে অল্প মাত্রায় অ্যলবুমিন যায়। যা প্রতি ২৪ ঘন্টায় ৩০থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম ।প্রস্রাবে নির্গত এই অল্প পরিমাণ অ্যালবুমিনকে বলা হয় মাইক্রোঅ্যালবুমিন (Microalbumin), যা সাধারণ ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় না। এটি বিশেষ মেশিনের সাহায্যে নির্ণয় করতে হয়। মাইক্রোঅ্যালবুমিনিউরিয়া। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডায়াবেটিস থেকে কিডনি রোগ হতে সাধারণত ৫-১৫ বছর সময় লাগে। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের মধ্য থেকে ৩০-৪০ ভাগ লোকের কিডনি ফেইল্যুর হওয়ার আংশাকা থাকে। রক্তে অনিয়মিত গ্লুকোজ, উচ্চ রক্তচাপ ও বংশগত কারণ ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথির প্রধান কারণ। এ ছাড়াও ডায়াবেটিস জনিত স্নায়ু রোগের কারণে প্রস্রাবে সমস্যা ও ঘন ঘন ইনফেকশনের কারণে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথির লক্ষণও উপসর্গসমূহ

প্রাথমিক অবস্থায় নেফ্রোপ্যাথিতে আক্রান্ত হওয়ার পরও এর কোনও উপসর্গ লক্ষ্য করা যায় না। তবে যখন উপসর্গ দেখা যায়, ততদিনে কিডনি অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নেফ্রোপ্যাথির প্রধান উপসর্গ -পায়ে পানি এসে পা ফুলে যাওয়া এবং উচ্চ রক্তচাপ। এ সময় পরীক্ষা করলে শতর্করা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে চোখের জটিলতা ও স্নায়ুর জটিলতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত ডায়াবেটিস হওয়ার ৫-১৫ বৎসর এর মধ্যেই এ ধরনে জটিলতা দেখা যায়। প্রস্রাবে প্রচুর আলবুমিন যায় ও রক্তে অ্যালবুমিন করে আসে। এ পর্যায়ে চিকিৎসায় খুব ভাল ফল না পাবার সম্ভাবনই বেশি। তাই এমন পর্যায়ে নেফ্রোপ্যাথি র্নিণয়ের চেষ্টা করা উচিত, যখণ চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় সম্ভব । এ জন্যে প্রত্যেক ডায়াবেটিস রোগীর প্রস্রাবে মাইক্রোঅ্যঅবুমিন (Microalbumin) যায় কিনা তা দেখতে হবে।

প্রতি বছর অন্তত দুইবার প্রস্রাবের মাইক্রোঅ্যালবুমিন (Microalbumin) দেখা প্রয়োজন। কোন কিডনি রোগীর প্রস্রাবে প্রতি লিটারে২০ মিলিগামের বেশি অ্যলবুমিন গেলেইা বুঝতে হবে তার কিডনি আক্রান্ত হয়েছে। এই মাইক্রোঅ্যালবুমিন (Microalbumin) হল প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়াবেটিসজনিত কারণে কিডনি আক্রমণের অশনি সংকেত। তবে আনন্দের খবর হল এ পর্যায়ে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসার মাধ্যমে নেফ্রোপ্যাথি নিরাময় করা সম্ভাব।

বিলম্বিত নেফ্রোপ্যাথির লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ (Symptoms of late diabetic nephropathy)

প্রাথমিক পর্যায়ে যদি ডায়াবেটিসজনিত কিডনি রোগ নির্ণয় করা যায় এবং যদি রক্তের সুগার ও রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত থাকে - তবে ক্রামন্বয়ে কিডনি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। ধীরে ধীরে কিডনির কার্যকারিতা লোপ পায় এবং ক্রমান্বয়ে নিম্বলিখিত উপসর্গসমূহ দেখা দেয়

* প্রস্রাবে অতিরিক্ত অ্যালবুমিন/প্রোটিন

* উচ্চ রক্তচাপ

* গোড়ালীও পা ফোলা

* রাতে ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া

* রক্তে ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাওয়া

* ইনসুলিন এর প্রয়োজন কমে যাওয়া

* ক্ষুধা মন্দা, বমি বমি ভাব

* দুর্বল হয়ে যাওয়া ও রক্তশূন্যতা দেখা দেয়া

* বিনা কারণে গা চুলকানো

এ পর্যায়ে চিকিৎসার মাধ্যমে কিডনি রোগ নিরাময় করা সম্ভব নয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা ফেইল্যুর বিলম্বিত করা যেতে পারে।

ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথি নির্ণয়ের জন্য কি কি পরীক্ষা করা দরকার

প্রস্রাব ও রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি নির্ণয় করা হয়

* প্রস্রাব - মাইক্রোঅ্যালবুমিন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি বিলম্বিত নেফ্রোপ্যাথি (Late nephropathy) হয় তবে ২৪ ঘন্টার প্রস্রাবে প্রোটিনের পরিমাণ দেখতে হবে।

* রক্ত- গ্লুকোজ, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, অ্যালবুমিন ও HbA_1C

চিকিৎসা ও প্রতিরোধ

ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথির চিকিৎসা নির্ভর করে ডায়াবেটিস দ্বারা কিডনি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার উপর । ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথি ঠেকানোর প্রধান শর্ত রোগীর ডায়াবেটিস পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা। এ ক্ষেত্রে ট্যাবলেট - এর পরিবর্তে ইনসুলিন দ্বারা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা শ্রেয়।

যা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি তা হল- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, উচচ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণও প্রস্রাবে আমিষ নির্গত হওয়ার পরিমাণ কমানোর ব্যবস্থা করতে পারলে নেফ্রোপ্যাথি হওয়া সত্ত্বেও কিডনি ফেইল্যুর হবার প্রবণতা অনেকাংশে কমানো সম্ভব। এই ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ কমানোর জন্য ACEI ড্রাগ যেমন: **ক্যাপটোপ্রিস বা এনালাপ্রিল** গ্রুপের ওষধুকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এ ওষুধ মাইক্রোঅ্যালবুনেমিয়া কমিয়ে নেফ্রোপ্যাথি নিরাময় করতে পারে। যাদের বেশি মাত্রায় আমিষ যাচ্ছ, তাদের কিডনি অকেজো বিলম্বিত করতে পারে। এমন কি যাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক তাদের মাইক্রো অ্যালবুমিন নিরাময়ের জন্য ACEI প্রয়োগ করে নিরাময় করা যায়। তা ছাড়া খাবার তালিকায় আমিষের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং যাদের শরীরে পানি এসে গেছে তাদের স্বল্প পরিমাণে পানি পান ও লবণ পরিহার করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়' অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় ডায়াবেটিস নেফ্রোপ্যাথি নির্ণয় ও তার চিকিৎসা ডায়াবেটিস জনিত কিডনি ফেইল্যুর প্রতিরোধের পূর্বশর্ত।

বৃদ্ধ বয়সের খাবারের তালিকা

প্রাকৃতিক নিয়মেই এক সময় বার্ধক্য চলে আসে। ত্রুটিপূর্ণ বা অজ্ঞানতাবশতঃ ভুল খাদ্যাভাসের জন্য যদি একটি পুষ্টি উপাদানের অভাব দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, তবে তারপ্রভাব বয়স বাড়ার সাথে সাথে শরীরের উপর পড়ে। এজন্য জীবনের শুরু থেকেই সব ধরনের খাবার খেয়ে শরীরকে রোগমুক্ত ও সুস্থ সবল রাখার চেষ্টা করতে হবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শারীরিক শ্রম ক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবেই কমে আসে এবং সেজন্য প্রতিদিনের খাবার তালিকা থেকে ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, বিভিন্ন ধরনের তেলেভাজা খাবার , বিভিন্ন ধরণের মিষ্টি জাতীয় খাবার মাছ, মাংসের তৈরী বিভিন্ন ধরনের খাবার, ফাস্টফুট ইত্যাদি কমিয়ে দিতে হবে। কেননা এই সময়ে শরীরের বিপাকের হার কমে যায় ও চলাফেরা, কাজকর্মও কমে যায়। অতএব পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় যে ধরনের খাবার গ্রহণ করেছেন সে ধরণের খাবার গ্রহণ করলে শরীরের ওজন দ্রুত বেড়ে যাবে এবং এই বাড়তি ওজনের ফলে শরীর বিভিন্ ধরণের রোগে আক্রান্ত হবে। সেজন্য পঞ্চাশের উপরে বয়স হলেই সারাদিনের মোট খাবারে পরিমাণ আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা উচিত। তেল ও চর্বিজাতীয় খাবার কম খেতে হবে যাতে খাবারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালরী না আসে। তবে বৃদ্ধ বয়সে ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে দুধের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। সেই জন্য সম্ভব হলে প্রতিদিন ২গ্লাস দুধ (কম চর্বিযুক্ত) গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি , ফল, সালাদ এবং বিভিন্ ধরণে ডাল, ছোটমাছ ইত্যাদি খেলে বিভিণ্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই বয়সে আঁশযুক্ত খাবার যেমন ফল, সালাদ ও শাকসজি বেশী খেতে হবে।

বাধর্ক্যে্ সারাদিনের খাদ্য তালিকা নিম্নরূপ হতে পারে

সকালের খাবারঃ

রুটি -২টি

ডিম-১টা /ডাল- -কাপ

সবজি-১কাপ

ফল-১টা (টক জাতীয়)

নাস্তাঃ

বিস্কিট-২টি

দুধ-১গ্লাস (সর তোলা)

দুপুরের খাবারঃ

ভাত-২ কাপ

ডাল-১কাপ

মাছ/মাংস-১টুকরা

সবজি-১কাপ

শাক-$\frac{১}{২}$ কাপ

নাস্তাঃ

বিস্কিট-২পিস

ফল-১টা (মিষ্টি জাতীয়)

রাতের খাবার ঃ

ভাত-২ কাপ

মাছ/মাংস-১টুকরা

ডাল-১কাপ

সবজি-১কাপ

রাতে ঘুমানোর আগে দুধ-১ গ্লাস (সর তোলা)

যদি কোন কারণে দুধ হজমে সমস্যা হয় তবে দই খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া দুধ হজম করার জন্য ১গ্লাস দুধের মধ্যে ২/৩ ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে ভালো়া করে মিশিয়ে খাওয়া যায়। এ বয়সে প্রচুর পানি পান করা শরীরের জন্য ভালো। এতে খাবারে পরিপাকে সহায়তা হয়। এছাড়া পরিমিত খাবার গ্রহণের সাথে সাথে সকাল অথবা বিকেলে একটু হাঁটাহাঁটি করা দরকার। এতে মন ও স্বাস্থ্য দুটোই ভালো থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ কি?

কিডনী যখন নিজস্ব কোন রোগ আক্রান্ত হয় অথবা অন্য কোন রোগে কিডনী আক্রান্ত হয়, যার ফলে কিডনীর কার্যকারিতা ৩মাস বা ততোধিক সময় পর্যন্ত লোপ পেয়ে থাকে তখন তাকে দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ বলা হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যদি কিডনী রোগ ছাড়াও কিডনীর কার্যকারিতা লোপ পায় তাহলেও তাকে দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ বলা যেতে পারে। যেমন–ক্রনিক নেফ্রাইটিস কিডনীর ফিল্টারকে আক্রমণ করে ক্রমান্বয়ে কিডনীর কার্যকারিতা কমিয়ে ফেলতে পারে যার ফলে দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ হতে পারে। ঠিক তেমনি ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ কিডনী রোগ না হওয়া সত্ত্বেও কিডনীর ফিল্টার/ ছাকনি ধ্বংস করতে পারে। আবার কারও যদি জন্মগতভাবে কিডনীর কার্যকারিতা কম থাকে অথবা কিডনীর আকার ছোট বা বেশী বড় থাকে তাহলেও দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ হতে পারে।

কি এই কিডনীর ছাকনী?

মানুষ জন্মগ্রহণ করার ৬ সপ্তাহের মধ্যেই কিডনীর ছাকনি বা ফিল্টার মেমব্রেন পুরোপুরি তৈরী হয়ে যায়। অর্থাৎ কিডনী পুরোদমে কাজ শুরু করতে পারে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রতিটি কিডনীতে প্রায় ১০-১২ লক্ষ ছাকনি রয়েছে এবং প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১৭০ লিটার রক্ত পরিশোধিত করে । এই পরিশোধিত রক্তের মধ্যে ১-৩ লিটার শরীরের বর্জ্য পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যেমে বের করে দেয়া হয়। সুতরাং কোন কারণবশতঃ যদি এ ধরনের ফিল্টার বাঁধাপ্রাপ্ত হয় তখন দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ হতে পারে।

কিডনীর কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য রক্তে ক্রিয়োটিনিন নামক জৈব পথার্থ পরিমাপ করা হয় যার মাধ্যমে কিডনী কতটুকু কাজ করতে তা বোঝা যায়, কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো এই জৈব পদার্থটি ৫০% কিডনীর কার্যকারিতা নষ্ট হওয়ার পরেই শরীরের বাড়তে পারে। একজন সুস্থ পুরুষ লোকের শরীরে ক্রিয়োটিনিন ১.৪মিঃ গ্রাঃ এবং মহিলার ১.৩ মিঃগ্রাঃ হিসাবে স্বাভাবিক ধরা হয়। যদিএই ক্রিয়েটিনিন পুরুষের ক্ষেত্রে ১.৪ মিলিগ্রাম এর উপরে ৩মাস বা ততোধিক স্থায়ী থাকে তখন তাকে দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগী হিসাবে সনাক্ত করা হয়।

বাংলাদেশে এই প্রথম কিডনী ফাউন্ডেশন এবং বিএসএম এমইউ এর উদ্যোগে সাভারের চাকুলিয়া গ্রামে বিগত ৩বছর ধরে কতজনের দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ

রয়েছে তার উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৩ হাজার প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের উপর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রায় শতকরা ১৮ভাগ মানুষ দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগে আক্রান্ত। এদের মধ্যে শতকরা ১৩ ভাগ রোগীর রক্তে ক্রিয়েটিনিন স্বাভাবিকের চেয়ে উপরে অর্থাৎ তাদের কিডনীর কার্যকারিতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৩ সালে ১৫৬২৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের উপর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এদের ১১ ভাগ দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগে আক্রান্ত। অস্ট্রোলিয়ায় এই সংখ্যা ১৬% এবং আইসল্যান্ড ১০%।

বাংলাদেশের এই সমীক্ষা থেকে এটা প্রতিয়মান হয় যে, বর্তমানে প্রায় ১কোটি ৮ লক্ষ লোক দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগে ভুগছে।

দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগের জটিলতা

দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগের সবচেয়ে অসুবিধা হলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের রোগীদের কোন উপসর্গ হয় না। ফলে বছরের পর বছর এরা চিকিৎসকের শরনাপন্ন হয় না। যখন তাদের উপসর্গ দেখা দেয় তখন তাদের কিডনীর কার্যকারিতা ৭৫% লোপ পেয়েছে্ কিডনী কার্যকারিতা ৭৫% লোপ পাওয়ার পর ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করে পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ফলে কিডনী যখন ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে তখন তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে যদি দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ নিরূপন করা যেত তাহলে বর্তমান চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগগুলোকে আংশিক বা পরিপূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব হতো। সুতরাং রোগী দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগে ভুগছে কিনা, তার জন্য জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরী। কেবল মাত্র সচেতনতার মাধ্যমেই একজন রোগীর কিডনী রোগ আছে কিনা তা জানা সম্ভব। যেমন যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের উপসর্গ থাকুক বা না থাকুক তার রক্তচাপ নিয়মিত পরিমাপ, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন নির্গত হচ্ছে কিনা তা জানা এবং ডায়াবেটিস আছে কিনা তা নিরূপন করা প্রয়োজন্ যদি কারো ডায়াবেটিস ধরা পড়ে অথবা ডায়বেটিসে ভুগে থাকেন তাকে অন্ততঃ বছরে ১বার প্রস্রাবের অ্যাবুমিন এবং মাইক্রো অ্যালবুমিন যাচ্ছে কিনা এবং রক্তে ক্রিয়েটিনিন স্বাভাবিক কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন । উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। বেশীর ভাগ দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগের কোন উপসর্গ হয় না্ তাই তারা ডাক্তারের শরনাপন্ন হয় না। সুতরাং কিডনী রোগের উপসর্গগুলো সম্বন্ধে সবারই ধারণা থাকা প্রয়োজন্ যদিও দীর্ঘস্থায়ী কিডনী অকেজো রোগে বমি বমি ভাব, ক্ষুধা-মন্দা, রক্ত স্বল্পতা, শরীরে পানি জমা, শ্বাস কষ্ট এবং

প্রস্রাবের পরিমানের তারতম্য, চর্মরোগ ছাড়াই শরীর চুলকানো এবং ক্রমান্বয়ে দৈনন্দিন কার্যকারিতা লোপ পাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ভাগ রোগী এবং উপসর্গগুলো নিয়েই চিকিৎসকের শরনাপন্ন হয় এবং পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কিডনীর ৮০ ভাগ কার্যকরিতাই তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী কিডনী অকেজো হওয়ার ফলে উপরিউক্ত উপসর্গ ছাড়াও শরীরে অনেক জটিলতা দেখা দেয়। যার মধ্যে প্রধান হলো হৃৎপিন্ডের রোগ। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে এটা প্রতিয়মান হয় যে, যারা দীর্ঘস্থায়ী কিডনী অকেজো রোগে ভোগে তাদের হৃৎপিন্ডের রোগের সম্ভাবনা ১০-৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ৭০ভাগও ছাড়িয়ে যেতে পারে। যেমন-যুক্ত রাষ্ট্রের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দীর্ঘস্থায়ী কিডনী অকজো রোগীর ৮০%-৯০% উচচ রক্তচাপ, ২৫% হার্ট ষ্ট্রোক এবং২০% হার্ট ফেইলর রোগে ভুগে থাকে। ৭৫%এর হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ট বড় হয়ে যায় এবং ৬% এর ক্ষেত্রে ব্রেইন ষ্ট্রোক এর প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। আর ডায়াবেটিস জনিত কিডনী রোগের কারণ উপরোক্ত হার আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কিডনী অকেজো রোগীরা সর্বদাই রক্ত স্বল্পতায় ভুগে থাকে। যা পরবর্তী কালে হৃৎপিন্ডে প্রকোষ্টের আকার বড় করে হার্ট ফেইলর করতে পাে। এছাড়া এদের রক্তে চর্বিতে ভারসাম্য থাকে না এবং ভিটামিন -ডি এর অভাব হয়। এই ভিটামিন -ডি ছাড়াও শরীরের স্বাভাবিক ক্যালসিয়াম এবং ফসফেট এর ভারসাম্য লোপ পায় এবং প্যারাথাইরয়েড হরমোন বৃদ্ধি পায়, যা মানুষের অস্থির বিভিন্ন রকম রোগের সৃষ্টি করে। যখন কিডনীর কার্যকারিতা আরও বেশী লোপ পায় শরীরের ক্ষার ও পটাশিয়াম এর ভারসাম্য লোপ পায়। আর এ সবের জন্যই দীর্ঘস্থায়ী কিডনী অকেজো রোগী যখন চিকিৎসকের শরনাপন্ন হয়, তখন কিডনী রোগ নিরাময়ের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিডনী রোগের কারণে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে ক্ষতি সাধিত হয় তা চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় করার চেষ্টা করা হয়। এই সময় উচ্চ রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়। আর অস্থির রোগের জন্য ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি-৩ দেয়া হয়। রক্ত স্বল্পতার জন্য আয়রন টেবলেট ছাড়াও এইরেথ্রোপ্রোয়েটিন ইনজেকশন প্রয়োজন হয়। রোগীকে ১ম শ্রেণীর প্রোটিন নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ দেয়া হয়। আর শরীরের লবন, পটাসিয়াম এবং ক্ষার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতসব ব্যবস্থা নেয়ার পরেও কিডনীর কার্যকারিতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং তা এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। এই সময় রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিয়মিত ডায়ালাইসিস অথবা কিডনী সংযোজনের উপদেশ দেয়া হয়।

বিভিন্ন হাসপাতালে পরিসংখ্যান থেকে এটা ধারণা করা হতো বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ রোগরি কিডনী সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কিডনী ফাউন্ডেশন ও বিএসএমএমইউ এর উদ্যোগে সাভারের চাকুলিয়া গ্রাম এবং মিরপুর বস্তিবাসীদের নিয়ে গবেষণায় দেকা যায় যে, এ চিত্র আরও ভয়াবহ। বছরে প্রায় ৩৫,০০০ রোগী সম্পূর্ন কিডনী অকেজো হয়ে মৃত্যুবরণ করছে এবং যখন একজন রোগী সম্পূর্ণ কিডনী অকেজো রোগে আক্রান্ত হয় তখন প্রায় ২০০ জন রোগী কিডনী অকেজো হওয়ায় পথে থাকে (ঝঃধমব ১১১১ঠ)। অন্যান্য আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি ১০লাখে প্রায় ১৫০-২০০ জন রোগীর কিডনী অকেজো হয়ে যাচ্ছে।

এই উদ্ভহারে কিডনী অকেজো হওয়ার হিসাবে জায়াবেটিস ও উঃ রক্তচাপকেই দায়ী করা হয়ে থাকে। যদিও বাংলাদেশের মত অনেক উন্নয়নশীল দেশেও ক্রনিক নেফ্রাইটিস রোগটিই কিডনী অকেজো হওয়ার প্রধান কারণ। নেফ্রাইটিস রোগ প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য ব্যাকটেরিয়া জনিত ইনফেকশন, ভাইরাস হেপাটাইটিস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া কালা-জ্বর এবং ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে দায়ী করা হয়। খাবারে রাসায়নিক পদার্থ মিশানো এবং ভেজাল ক্রমিক ইন্টারস্টেশিয়া-নেফ্রাইটিস এর কারণ হিসাবে দায়ী করা যেতে পারে। এমনকি পানিতে অধিক পরিমাণে আর্সেনিক কিডনী রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে মার্কারী, লেড, গোল্ড এবং অন্যান্য ধাতব পদার্থ কিডনী রোগের কারণ হতে পারে। হেপাটাইটিস 'বি' এবং 'সি' ঐওঠ ভাইরাস দক্ষিণ আফ্রিকাতে দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগের একটি বড় কারণ। ঠিক তেমনি ম্যালেরিয়া আফ্রিকা মহাদেশে কিডনী রোগের কারণ হিসাবে বিবেচিত।

কিডনী

কিডনী স্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেলে শুধু ঔষধের মাধ্যমে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় নিয়মিত ডায়ালাইসিস অথবা কিডনী সংযোজন। বর্তমান বিশ্বে নিয়মিত ডায়ালাইসিস করে একজন রোগী ৫ থেকে ১৫ বছর এবং সফল কিডনী সংযোজনের মাধ্য ১০-১৫ বছর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। পৃথিবীতে নিয়মিত হেমোডায়ালাইসিস এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩০ বছর পর্যন্ত রোগী বেঁচে আছে এবং সফল কিডনী সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রায় ৩৩ বছর বেঁচে আছে। নিয়মিত ডায়ালাইসিস বলতে সপ্তাহে ৩ বার ৪ ঘণ্টা করে হেমোডায়ালাইসিস মেশিন এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা বোঝায়। ঠিক তেমনি নিকটাত্মীয়ের কিডনী নিয়ে

কিডনী প্রতিস্থাপনকে কিডনী সংযোজন ঝুঝানো হয়। অবশ্য উন্নত বিশ্বে মৃত ব্যক্তির কিডনী নিয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কিডনী সংযোজন করা হয়ে থাকে।

৬০% রোগী জানেই না যে তাদের ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ অথবা প্রস্রাবে প্রেটিন নির্গত হয় এবং তারা চিকিৎসকের শরনাপন্ন হন নি। সুতরাং এই রোগীগুলোই দীর্ঘস্থায়ী কিডনী অকেজো রোগে ভুগে ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণভাবে কিডনী বিনষ্ট হয়। এই রোগীগুলোকেই সনাক্ত করে চিকিৎসার ব্যবস্থ্অ করতে হবে।

কিডনী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বর্তমানে এটা পরীক্ষিত যে, এ.সি.ই-ইনহেবিটরস এবং এ.আর.বি জাতীয় উচ্চ রক্তচাপের ঔষধ কিডনী রোগ প্রতিরোধ করার জন্য খুবই কার্যকর। ঠিক তেমনি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা মাইক্রো-অ্যালবুমিন ধরা পড়লে জরুরীভিত্তিতে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম, ফাস্টফুড না খাওয়া, চর্বি জাতীয় খাবারের প্রতি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা গেলে কিডনী রোগ প্রতিরোধ সম্ভব। এবং ক্ষেত্রবিশেষে চর্বি কারনন্ত্রণকারী ঔষধ খেলে, ধুমপান না করলে কিডনী রোগ প্রতিরোধ করা যায় এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত হৃদরোগ থেকেও রেহাই পাওয়া যায়।

আমরা যদি আমাদের দেশের রোগীদেরকে সচেতন করতে পারি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্তকরণের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে লক্ষ লক্ষ কিডনী রোগী কিডনী সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়া থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাবে এবং দেশ কিডনী অকেজো রোগের ডায়ালাইসিস ও কিডনী সংযোজনের খরচ থেকে মুক্তি পাবে।

হামদর্দের বাজারজাত কিছু উপকারী ওষুধ

শর্ত বর্ষের উর্ধ্বে (১০৪ বছর) টিকে থাকার কৃতিত্ব বহনকারী **হামদর্দ (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ)**-এর কিছু উপকারী, অনেকটা নিরাপদ ওষুধের তালিকা

১. সিনকারা

পরিবারের সবার জন্য সব ঋতুতে ব্যবহার উপযোগী বিশ্ব নন্দিত আর্দশ হার্বাল শক্তি বর্ধক

কার্যকরীতাঃ

সিনকারা মেধা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, পুষ্টি ও ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ করে, মানসিক এবং দৈহিক দুর্বলতা, অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে, গর্ভকালনি রক্তাল্পতা পূরণ করে ও দুগ্ধদাত্রী মায়েদের দুগ্ধ নিঃসরণ বৃদ্ধি করে, ক্ষুধামান্দ্য দূর করে, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও পরিশ্রম সাধ্য ব্যয়ামের সময় শরীরে শক্তি যোগায় ও মানসিক দক্ষতা বাড়ায়, স্নায়ুরচাপ ও তীব্র অসুস্থ্তা দুর করে, এন্টিবায়োটিক সেবন জনিত ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ করে, অতিরিক্ত বিপাক জনিত সমস্যা দুর করে এবং লিভার সুরক্ষা করে।

২. ছাফী

১৯৩৯ সাল থেকে ব্যবহৃত, বহুমূখী গুণসম্পন্ন হার্বাল রক্ত পরিশোধক

কার্যকরীতাঃ

ছাফী রক্ত বিশুদ্ধ করে এবং প্রাকৃতিক ভাবে রক্ত পরিশোধন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে, ব্রণ ও মেছতা, রক্ত অবিশুদ্ধতা, ফোঁড়া, ফুসকুড়ি, ত্বকের বিষর্ণতা, সোরাইসিস, খুজলী, একমিজা, দাঁদ, শ্বেতী, কোষ্টকাঠিন্য, পায়ের ক্ষত, হাম, কুষ্ঠ, জলবসন্ত, আর্টিকেরিয়া, চুকারণী, নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ, প্রসাবের জ্বালা-পোড়া, মুখ ও গায়ের দুর্গন্ধ, ডায়াবেটিস, হেপাটাইটস, হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ, মেদ বহুলতা, বিষন্নতা দূর করে। ত্বক ফর্সা ও উজ্জ্বল করে, ত্বকের কোমলতা ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে এবং দেহকে স্লিম ও স্মার্ট রাখে।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২ চা চামচ সকালে সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১/২ -১ ট্যাবলেট দিনে ২-৩ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি।

৩. কারমিনা

পাকস্থলীর গোলযোগ নিরাময়ে আদর্শ হার্বাল ঔষদ

কার্যকরীতাঃ

হজমের দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য, পেটব্যথা, বায়ুজনিত পেটফাঁপা, বুকজ্বালা, বুকব্যথা, বমি, বমি বমি ভাব ও কোষ্টবন্ধতা দুর করে। কারমিনা লিভারকে শক্তিশালী করে,

পাকস্থলী ও লিভারের কার্যকারিতার মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধন করে পরিপাকতন্ত্রের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে।

সেবন বিধিঃ

ট্যাবলেট

প্রাপ্ত বয়স্ক: ১-২ ট্যাবলেট দিনে ২-৩ বার সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়সস্ক: ১/২-১ ট্যাবলেট দিনে ২-৩ বার সেব্য।

সিরাপ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২ চা চামচ দিনে ২-৩ বার সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১ চা চামচ দিনে ২-৩ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ-১০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি এবং কাঁচের বোতলে ৬০ ট্যাবলেট।

৪. ইকটার্ন

লিভারের গোলযোগ ও লিভার সুরক্ষার অনুপম হার্বাল ঔষধ

কার্যকরীতাঃ

ইকটার্ন সকল প্রকার জন্ডিস ও হেপাটাইটিসে অত্যন্ত কার্যকরী হার্বাল মহৌষধ। ইকটার্ন পিত্তনালীর প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে সঠিক ভাবে পিত্ত নিঃসরণে সহায়তা করে এবং লিভারের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রাখে। ইকটার্ন হেফাটাইটিস, জন্ডিস, শোথ, কোষ্টকাঠিন্য, ফুসফুসের আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ ও জরায়ুর প্রদাহ নিরাময় করে। ইকটার্ন রুচি বৃদ্ধি করে।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২-৩ চা চামচ দিনে ২ বার।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১/২-১ চা চামচ দিনে ২ বার ১৫ দিন থেকে ১ মাস সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি।

৫. ফেভনিল

জ্বর নিরাময়ের হার্বাল ঔষধ

কার্যকরীতাঃ

ফেভনিল জ্বল, হাম, জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড নিরাময় করে। ইহা রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকারি। ইহা প্রদাহ নাশক, মূত্রকারক, পাকস্থলী এবং লিভারের শক্তি বর্ধক। ফেভনিল দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২-৪ চা চামচ দিনে ২-৩ বার সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১/২-১ চামচ দিনে ২-৩ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি।

৬. নওনেহাল

নবজাতক ও শিশুদের দ্রুত শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক

সোডা ও এ্যালকোহলমুক্ত প্রাকৃতিক হজমকারক ও বায়ূনিঃসারক

কার্যকরীতাঃ

নওনেহাল শিশুদের বদহজম, পেটব্যথা, ফেটফাঁপা, খিচুনী, বমি, কোষ্টবদ্ধতা ও ডায়রিয়ার কার্যকারি। বিশেষত ইহা দাঁত উঠাকালীন শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে। অনেক সময় শিশুরা খিটখিটে মেজাজ দেখায়, কান্নাকাটি করে, ঘুম হয় না ও পরিমিত শারীরিক বৃদ্ধি হয় না, তাদের জন্য প্রাকৃতিক ভিটামিন সমৃদ্ধ নওনেহার অত্যন্ত সুফলদায়ক।

সেবন বিধিঃ

৬ মাস বয়স পর্যন্ত: ১/২ চা চামচ দিনে ৩-৪ বার সেব্য।

৬ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত: ১ চা চামচ দিনে ৩-৪ বার সেব্য।

১ বছরের উর্দ্ধে: ২ চা চামচ দিনে ৩-৪ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি।

৭. এলভাসিন

ফুসফুস ও শ্বসনতন্ত্রের শক্তি ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির হার্বাল মহৌষধ

কার্যকরীতাঃ

এলভাসিন কফ নিঃসারক ও কাশি নিবারক। এলভাসিন বুকে কফ জমাট বাধা, সকল প্রকার কাশি, ব্রংকাইটস, ব্রঙ্কিয়াল এ্যাজমা, টনসিলের প্রদাহ, কণ্ঠনালীর প্রদাহ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা নিরাময় করে। এলভাসিন এলার্জি এবং তন্দ্রাচ্ছন্নতা মুক্ত সকল বয়সের নারী ও পুরুষের জন্য নিরাপদ ও সুসহনীয় কার্যকরি কাশির ঔষধ।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২-৫ চা চামচ দিনে ২ বার সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১-২ চা চামচ দিনে ২ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি ও ২২৫ মিলি।

৮. সাদুরী

কফ নিঃসারক ও ফুসফুসের শক্তিবর্ধক

কার্যকরীতাঃ

সাদুরী বুকের জমাট বাধা কফ তরল আকারে বের করে দিতে সহায়তা করে। ইহা ফুসফুসের শক্তি ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সাদুরী সর্দি, কাশি, হুপিংকাশি, হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট, ইনফ্লুয়েঞ্জা, গলাব্যথা, শ্বাসনালীর প্রদাহ ও ফুসফুসের দুর্বলতায় কার্যকরি। সাদুরী দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২ চামচ দিনে ২-৩ বার ঈষদুষ্ণ পানিসহ সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১/২ চামচ দিনে ২-৩ বার ঈষদুষ্ণ পানিসহ সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি।

৯. মাস্তুরীন
হার্বাল ইউটেরোটনিক

কার্যকরীতাঃ

মাস্তুরীন অনিয়মিত ঋতুস্রাব, ব্যথাযুক্ত উতুস্রাব, শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর প্রদাহ, হিস্টিরিয়া ও রক্তাল্পতা দূর করে এবং সুনিদ্রা আনয়ন করে। ইহা মহিলাদের প্রয়োজনীয় হরমোনের সমতা নিয়ন্ত্রণ করে কর্মক্ষম ও সবল করে এবং কমনীয় ও আর্কষণীয় করে তোলে। ইহা জরায়ুর ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে।

সেবন বিধিঃ

অনিয়মিত মাসিক: ২ চা চামচ হালকা গরম পানিসহ রাতে (মাসিকের পর হতে পরবর্তী মাসিকের পূর্ব পর্যন্ত) সেব্য।

অন্যান্য ক্ষেত্রে: ২ চা চামচ রাতে সেব্য, রোগ দীর্ঘস্থায়ী হলে ২ চা চামচ দিনে ২ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি।

১০. এ্যালকুলী
জ্বর নিবারক ও মূত্রকারক

কার্যকরীতাঃ

জ্বর, মূত্রকৃচ্ছতা, মূত্রবদ্ধতা, ঋতুবদ্ধতা, লিভারের প্রদাহ, প্রতিবন্ধকতাজনিত জন্ডিস উপশম করে। এ্যালকুলী লিভার, কিডনী ও পিত্তথলীর বর্জ্য পদার্থ অপসারণের মাধ্যমে এসকল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সমূহের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রাখে। এ্যালকুলী রক্তের অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২-৪ চা চামচ দিনে ২-৪ বার সমপরিমান পানিসহ সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১-২ চা চামচ দিনে ২-৪ বার সমপরিমান পানিসহ সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি ও ৪৫০ মিলি।

১১. মারবেলাস

পেটের যাবতীয় গোলযোগ নিরাময়ের জন্য উত্তম হার্বাল ঔষধ

কার্যকরীতাঃ

মারবেলাস পেটের যাবতীয় গোলযোগ, ইরিটেবল বাওয়াল সিনড্রোম, ডায়রিয়া, ব্যাকটেরিয়া জনিত আমাশয় (ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি), অ্যামিবা জনিত আমাশয় (অ্যামিবায়াসিস), জিয়ারডিয়া জনিত আমাশয় ও পাতলা পায়খানা (জিয়ারডিয়াসিস), অম্লাধিক্য, পেপটিক আলসার, অজীর্ণতা, পেটফাঁপা, বদহজম, বমি ও বমি বমি ভাব দুর করে।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২ চা চামচ দিনে ৩-৪ বার সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১ চা চামচ দিনে ৩-৪ বার পানিসহ সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি ও ২২৫ মিলি।

১২. জিনসেন্ট

হার্বাল মহাশক্তি বর্ধক

কার্যকরীতাঃ

জিনসেন্ট অশ্বগন্ধা, কালিজিরা, আমলকি, পেয়ারা, লালবামন ইত্যাদি শক্তিবর্ধক এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর মূল্যবান ঔষধি উদ্ভিদের সমন্বয়ে প্রস্তুত। জিনসেন্ট সঞ্জীবনী ঔষধ যা দেহে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে, সকল প্রকার শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে। জিনসেন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, জৈবিক চাহিদা বাড়ায়, দেহের প্রয়োজনীয় এনজাইম ও হরমোন উৎপাদনে সহায়তা করে। জিনসেন্ট প্রাকৃতিক এন্টিঅক্সিডেন্ট ও এ্যাডাপটোজেনিক হিসেবে কাজ করে। জিনসেন্ট অকাল বার্ধক্য প্রতিরোধ করে, সুস্থ, সুন্দর, সাবলীল ও যৌবনদীপ্ত দীর্ঘ জীবন দান করে।

সেবন বিধিঃ

২-৪ চা চামচ দিনে ২ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি, ২২৫ মিলি ও ৪৫০ মিলি।

১৩ জোশিনা

সর্দি ও কাশি নিরাময় করে

কার্যকরীতাঃ

জোশিনা সর্দি, কাশি, সর্দিজ্বর, সর্দি জনিত গায়ে ব্যথা ও মাথা ব্যথা, ব্রংকাইটিস, টনসিলের প্রদাহ, গলাব্যথা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কণ্ঠনালীর প্রদাহ, নিউমোনিয়া ও হুপিংকাশি নিরাময়ে নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক চিকিৎসা।

সেবন বিধিঃ

প্রতি স্যাচেট ১ কাপ গরম পানিতে মিশিয়ে চায়ের মত দিনে ২-৩ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

প্রতি বাক্সে ২৫ স্যাচেট।

১৪. সুয়ালিন

স্বরভঙ্গ, সর্দি, কাশি ও ব্রংকাইটিস নিরাময়ে অব্যর্থ হার্বাল ঔষধ

কার্যকরীতাঃ

সুয়ালিন খুশখুশে কাশি, গলাব্যথা, টনসিলের ব্যথা, শ্বাসনালীর প্রদাহ, স্বরভঙ্গ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্রুত উপমশ করে। সর্দি ও কাশির ফলে অনেকসময় শ্বাসনালী বন্ধ হওয়ার আশংকা দেখা দেয় ও শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয় এসময় ট্যাবলেট সুয়ালিন কফ বের করে দিয়ে শ্বাস নালী পরিষ্কার করে।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ১-২ ট্যাবলেট দিনে ৩-৪ বার চুষে খেতে হবে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: (৬-১২ বছর) ১ ট্যাবলেট দিনে ৩-৪ বার চুষে খেতে হবে।

ঔষধটি গুড়া করে গরম পানি অথবা চায়ের সাথে মিশিয়ে সেবন করলে অধিক ফল পাওয়া যায়।

পরিবেশনাঃ

প্রতি বাক্সে ১০×১০ ট্যাবলেট।

১৫. কুলজম

দশ রোগের একই চিকিৎসা

কার্যকরীতাঃ

মাথাব্যথা, দাঁতব্যথা ও পোড়া ঘা, কানব্যথা, সর্দি, কাশি ও কফ, পোকা মাকড়ের কামড়, খোস পাচড়া ও চুলকানি, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, নিউমোনিয়া ও কোমরের বাত, পেটের অসুখ, কলেরা, প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী প্রতিরোধ ও নিরাময় করে।

ব্যবহারবিধিঃ

প্যাকেটে সরবরাহকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহার করুন।

সতর্কতাঃ

কুলজম চোখের ভিতরে ও বাহিরে ব্যবহার নিষিদ্ধ

পরিবেশনাঃ

১৫ মিলি ড্রফার।

১৬. সুরবিন

হার্বাল বাত ও বেদনানাশক

কার্যকরীতাঃ

সুরবিন কটিবাত, সন্ধিবাত, গেঁটেবাত, সায়াটিকা, গ্রন্থি প্রদাহ ও ফোলা দুর করে ও দেহে ল্যাকটিক এসিড তৈরী প্রতিরোধ করে, ইউরিক এসিড দ্রুত অপসারণ করে।

সেবন বিধিঃ

১-২ ট্যাবলেট দিনে ২ বার আহারের পর ৭ দিন থেকে ২১ দিন অথবা চিকিঃসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

পরিবেশনাঃ

প্রতি বাক্সে ষ্ট্রীপবদ্ধ ৫×১০।

১৭. পেচীস

আমাশয়, ডায়রিয়া ও পেট ব্যথায় কার্যকরী

কার্যকরীতাঃ

ট্যাবলেট পেচীস আমাশয়, ডায়রিয়া ও পেটব্যথায় অত্যন্ত কার্যকরি। পেচীস ডায়রিয়া ও আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবের বিরুদ্ধে কাজ করে, পেটের খিচুনি ও ব্যথা দুর করে। পেচীস বৃহদন্ত্র ও অন্ত্রনালীর অভ্যন্তরীন স্তরে সৃষ্ট ক্ষত সারিয়ে তোলে।

সেবন বিধিঃ

১-২ ট্যাবলেট দিনে ২-৩ বার সেব্য। রক্ত আমাশয়ের ক্ষেত্রে ৭-১৫ দিন, দীর্ঘ মেয়াদী আমশয়ের ক্ষেত্রে ৭ দিন-১মাস সেব্য।

পরিবেশনাঃ

প্রতি বাক্সে ষ্ট্রীপবদ্ধ ৫×১০ ট্যাবলেট।

১৮. দোলাবী

ডায়াবেটিস নিরাময়ে অনন্য প্রাকৃতিক মহৌষধ

কার্যকরীতাঃ

ট্যাবলেট দোলাবী ডায়াবিস নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত কার্যকরি। ইহা অগ্ন্যাশয়ের ত্রুটি দূর করে, ইনসুলিন নিঃসরণ স্বাভাবিক রাখে ও রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখে। ইহা কোলেষ্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড এর মাত্রা হ্রাস করে। কিডনীর সুরক্ষা করে এবং হৃদ রোগের ঝুকি কমায়।

সেবন বিধিঃ

১-২ ট্যাবলেট দিনে ২ বার খাওয়ার আধ ঘন্টা পূর্বে পানিসহ সেব্য।

পরিবেশনাঃ

ব্লিষ্টার প্যাকে ৫×১০ ট্যাবলেট।

১৯. সেনচুরিন

মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনন্য হার্বাল ঔষধ

কার্যকরীতাঃ

সেনচুরিন বহুমুখী গুণসম্পন্ন হার্বাল ঔষধ যা মস্তিষ্কের শক্তি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বার্ধক্য জনিত রোগ ও অকাল বার্ধক্য প্রতিরোধ করে এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্দি করে। সেনচুরিন মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষ-কলায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করে। সেনচুরিন মস্তিষ্কের খাদ্য হিসাবে কাজ করে। ইহা মস্তিষ্কের কোষের ধবংশ ও ক্ষয় প্রতিরোধ করে ও নতুন কোষ উঃপাদনে সহায়তা করে। সেনচুরিন মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করে রাখে। সেনচুরিন কাজের দক্ষতা, মনোযোগ, মস্তিষ্কের মটর নার্ভের কার্যকারিতা, ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ ক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে। সেনচুরিন স্নায়ুকেন্দ্রকে স্বচ্ছ এবং সজাগ রাখে।

সেবন বিধিঃ

১-২টি ক্যাপসুল দৈনিক ২ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

প্রতি বাক্সে ব্লিষ্টার প্যাকে ৫×১০ ক্যাপসুল।

২০. ইস্‌পাগুল

আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য ও অর্শরোগ নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরি

কার্যকরীতাঃ

ইসপাগুল পাকস্থলীর জ্বালাপোড়া, আলসার, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া এবং অর্শ রোগ নিরাময়ে কার্যকরি। ইহা রক্তে অতিরিক্ত কোলেষ্টেরল, ক্ষতিকর চর্বি ও গ্লুকোজের মাত্রা হ্রাস করে। ইহা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও উচ্চ রক্ত চাপ প্রশমনে অত্যন্ত কার্যকরি।

সেবন বিধিঃ

১ স্যাচেট এক গ্লাস পানিতে মিশিয়ে সকালে খালি পেটে অথবা রাতে শোবার পূর্বে সেব্য। ইস্‌পাগুল সেবন কালে প্রচুর পরিমাণে পানি সেবন করা বাঞ্চনীয়।

পরিবেশনাঃ

আকর্ষনীয় বাক্সে ২৫টি স্যাচেট।

২১. জারনাইড

শুক্রমেহ ও অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ নিরাময়ে অব্যর্থ মহৌষধ

কার্যকরীতাঃ

জারনাইড শুক্রমেহ ও অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ উপশম করে। ইহা প্রস্রাবের জ্বালা-পোড়া দূর করে এবং পুরুষাঙ্গে অতি স্পর্শকাতরতা দূর করিয়া অনুভুতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনে।

সেবন বিধিঃ

১-২ চা চামচ দিনে ২-৩ বার আহারের পর ১-২ মাস পর্যন্ত সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ১০০ মিলি।

২২. ইন্দেমালী

পাকস্থলীর অম্লনাশক ও ক্ষতসারক

কার্যকরীতাঃ

ইহা অম্লাধিক্য, পাকস্থলীর ক্ষত, পাকস্থলীর ঝিল্লির প্রদাহ, পিত্তজনিত বমি ভাব, পেট ফাঁপা, মলত্যাগের সময় খিঁচুনী ও ব্যথা, আমাশয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরি।

সেবন বিধিঃ

১ স্যাচেট দৈনিক ২ বার আহারের পূর্বে পানিসহ সেব্য।

পরিবেশনাঃ

প্রতি বাক্সে ২০টি স্যাচেট।

২৩. আলিসা

সুস্বাস্থ্যের প্রতীক

কার্যকরীতাঃ

ডায়াবেটিস, বাতব্যথা, গেঁটে বাত, গলায় সংক্রমণ, হাঁপানী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, উচ্চরক্তচাপ এবং রক্তে কোলেষ্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি জনিত সমস্যা দুর করে, বাড়তি

মেদ ও হার্ট এ্যাটাকের ঝুকি কমায়। ইহা ক্ষতিকর জীবাণু ধবংশ করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

সেবা বিধিঃ

১ ট্যাবলেট দিনে ২ বার আহারের পর সেব্য।

পরিবেশনাঃ

আকর্ষণীয় ব্লিষ্টার প্যাকে ৫×১০ ট্যাবলেট।

২৪. হ্যানরয়েড

অর্শ রোগ নিরাময়ের প্রাকৃতিক ঔষধ

কার্যকরীতাঃ

বায়ু অর্শনাশক ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক। ইহা মলদ্বার ফোলা, অসহনীয় ব্যথা ও চুলকানী নিরাময়ে বিশেষ ফলপ্রদ।

সেবন বিধিঃ

১ ট্যাবলেট সকালে ও ১ ট্যাবলেট রাতে শয়নকালে দুধ বা পানি সহ ১ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত অথবা চিকিৎসকের পরামর্শমত সেব্য।

পরিবেশনাঃ

আকর্ষনীয় ব্লিষ্টার প্যাকেব ৫×১০ ট্যাবলেট।

২৫. সূজার্ন

গণোরিয়া রোগের নির্ভরযোগ্য ওষুধ

কার্যকরীতাঃ

ইহা গণোরিয়া, প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া, মূত্র নালীর ক্ষত, শ্বেত প্রদর, মূত্রাশয় ও মূত্রনালীর দুর্বলতায় অত্যন্ত কার্যকরি।

সেবন বিধিঃ

১-২ ট্যাবলেট আহারের পূর্বে দিনে ২ বার ১৫ দিন থেকে ১ মাস পর্যন্ত সেব্য।

পরিবেশনাঃ

আকর্ষনীয় ব্লিষ্টার প্যাকে ৫×১০ ট্যাবলেট।

২৬. ডারমেইড

সকল প্রকার চর্মরোগ নিরাময়ের নির্ভরযোগ্য হার্বাল এ্যান্টিসেপটিক অয়েন্টমেন্ট

কার্যকরীতাঃ

খোস-পাঁচড়া, চুলকানি, দাদ, পুঁজযুক্ত গুটিকা, অর্শসহ সকল চর্মরোগে কার্যকরী হার্বাল ওয়েন্টমেন্ট।

সেবন বিধিঃ

প্রয়োজনমত ক্ষত স্থানে বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য।

পরিবেশনাঃ

প্লাষ্ট্রিক টিউবে ২০ গ্রামে অয়েন্টমেন্ট।

২৭. হাল্যাক্স

বায়ুনাশক ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক

কার্যকরীতাঃ

পেটফাঁপা, পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি ও মেদ-ভূড়ি কমাতে বিশেষ উপকারী। সঞ্চিত মল পরিস্কার করে ক্ষুধা বৃদ্ধি করতে অতুলনীয়।

সেবন বিধিঃ

২ ট্যাবলেট রাতে আহারের পর ৭ থেকে ২১ দিন পর্যন্ত সেব্য।

পরিবেশনাঃ

আকর্ষনীয় ব্লিষ্টার প্যাকে ৫×১০ ট্যাবলেট।

২৮. চ্যবনপ্রাশ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হার্বাল টনিক

কার্যকরীতাঃ

হামদর্দ চ্যবনপ্রাশ একটি অদ্বিতীয় প্রাকৃতিক শক্তিবর্ধক যা সাধারণ দুর্বলতা দূর করে এবং শরীরে দৃঢ়তা প্রদান করে। ইহা ক্ষয়রোগ, কাশি এবং ঠান্ডা জনিত যে কোন সমস্যায় ইহা অত্যন্ত কার্যকর। চ্যবনপ্রাশ শ্বসনতন্ত্রের শক্তি ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে ও দেহের পুষ্টির অভাব দূর করে।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ১-২ চা চামচ দিনে ২ বার।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১/২ চা চামচ দিনে ২ বার ১-৩ মাস সেব্য।

পরিবেশনাঃ

১০০ গ্রাম, ২৫০ গ্রাম ও ৫০০ গ্রাম।

২৯. বলারিষ্ট

মহাশক্তিবর্ধক

কার্যকরীতাঃ

শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, ওজনহ্রাস, ক্ষুধামান্দ্য এবং বাত রোগে কার্যকরী।

সেবন বিধিঃ

২-৪ চা চামচ দিনে ২-৩ বার।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ৪৫০ মিলি।

৩০. মোস্তাকারিষ্ট

পরিপাকতন্ত্রের অঙ্গসমূহের শক্তি ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে

কার্যকরীতাঃ

ইহা বদহজম, অরুচি, অজির্নতা, ডায়ারিয়া ও আমাশয়ে অত্যন্ত কার্যকরি।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২-৪ চা চামচ দিনে ২-৩ বার।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১/২-১ চা চামচ দিনে ২-৩ বার।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ৪৫০ মিলি।

৩১. অশ্বগন্ধারিষ্ট

স্নায়ু শক্তিবর্ধক

কার্যকরীতাঃ

স্নায়বিক দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তির গোলযোগ, অনিন্দ্রা, শীর্ণতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, মৃগী, মূর্ছা, বাত, উন্মাদ ইত্যাদি নিরাময় করে।

সেবন বিধিঃ

২-৪ চা চামচ দিনে ২-৩ বার আহারের পরে সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ৪৫০ মিলি।

৩২. রোহিতকারিষ্ট

লিভার ও স্প্লীনের বিভিন্ন গোলযোগ নিরাময়ে কার্যকরি

কার্যকরীতাঃ

লিভারের প্রদাহ, জন্ডিস, শোথ লিভার ও প্লিহার বৃদ্ধি, বদহজম ও অরুচি দুর করে।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২-৪ চা চামচ দিনে ২-৩ বার সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১/২-১ চা চামচ দিনে ২-৩ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ৪৫০ মিলি।

৩৩. অশোকারিষ্ট

স্ত্রী রোগ নিরাময়ের নির্ভরযোগ্য হার্বাল ওষুধ

কার্যকরীতাঃ

রক্তপ্রদর, রক্তস্রাব জনিত শোথ, ক্ষধামান্দ্য ও অরুচি দূর করে।

সেবন বিধিঃ

২-৪ চা চামচ দিনে ৩ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ৪৫০ মিলি।

৩৪. অমৃতারিষ্ট

জ্বর নিরাময়ের নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক ওষুধ

কার্যকরীতাঃ

ইহা জ্বর, পুরাতন জ্বর, লিভার ও স্প্লীনের বৃদ্ধিজনিত সমস্যা দুর করে।

সেবন বিধিঃ

প্রাপ্ত বয়স্ক: ২-৪ চা চামচ দিনে ৩ বার সেব্য।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক: ১/২-১ চা চামচ দিনে ৩ বার সেব্য।

পরিবেশনাঃ

সিরাপ ৪৫০ মিলি।

৩৫. ত্রিফলা চুণ

পেটের যাবতীয় গোলযোগ দুর করে ও শক্তিশালী এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট

কার্যকরীতাঃ

কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য, বদহজম, ডায়াবেটিস, চর্মরোগ, লিভারের গোলযোগ, রক্ত দুষন, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগে উপকারী। ইহা দেহের গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ সমূহের শক্তি বৃদ্ধি করে।

সেবন বিধিঃ

১ স্যাচেট দিনে ২-৩ বার গরম পানিসহ সেব্য।

পরিবেশনাঃ

প্রতি বাক্সে ২৫ স্যাচেট।

Chairmen, Ex. Chairmen
&
Members of Board of Trustees
Hamdard (Bangladesh & Pakistan)

National Prof. (Dr.) Nurul Islam
S.I., DSc (Hon), FRCP, IDA
Chairman, Board of Trustees, Hamdard Bangladesh
National Professor of Bangladesh, Founder Vice Chancellor, USTC
Former Personal physician of Father of the Nation, ***Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman***
1972-1975

Mrs. Sadia Rashid
Chairperson

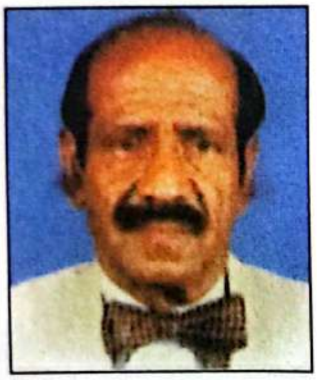

Late Barrister Shaukat Ali Khan
He was one of the national heroes of language movement, democratic movement & liberation movement. He was the Chairman of Board of Trustees, Hamdard Bangladesh.

Justice Mohammed Abdur Rouf
He was the Chief Election Commissioner of Bangladesh and former Chairman of Board of Trustees, Hamdard Bangladesh.

Late Justice Abul Fazal Md. Ahsan Uddin Chowdhury
He was the honourable President of People's Republic of Bangladesh (1982-1983) and first Chairman of Board of Trustees, Hamdard Bangladesh.

Dr. Navaid-ul-Zafar
Managing Director

Vice Chairmen
Members of Board of Trustees
Hamdard Bangladesh

Dr. Humayun K. M. A. Hye
Vice Chairman
He was the Founder Director
of Drug Administration

M. Ataur Rahman
Member
Former Secretary of the
Ministry of Religious Affairs

Prof. Dr. A. K. Azad Khan
Member
President
Diabetic Association of Bangladesh

Prof. Dr. Mahmud Hassan
Member
President BMA
Former Vice Chancellor BSMMU

Dr. Hakim Md. Yousuf Harun Bhuiyan
Member Secretary
He is the builder of Modern Hamdard in Bangladesh. At present he is the Managing Director of Hamdard Laboratories (waqf) Bangladesh and General Secretary of Hamdard Foundation Bangladesh. By virtue of his versatile activities the tremendous growth & development of Hamdard has been started from 1972..

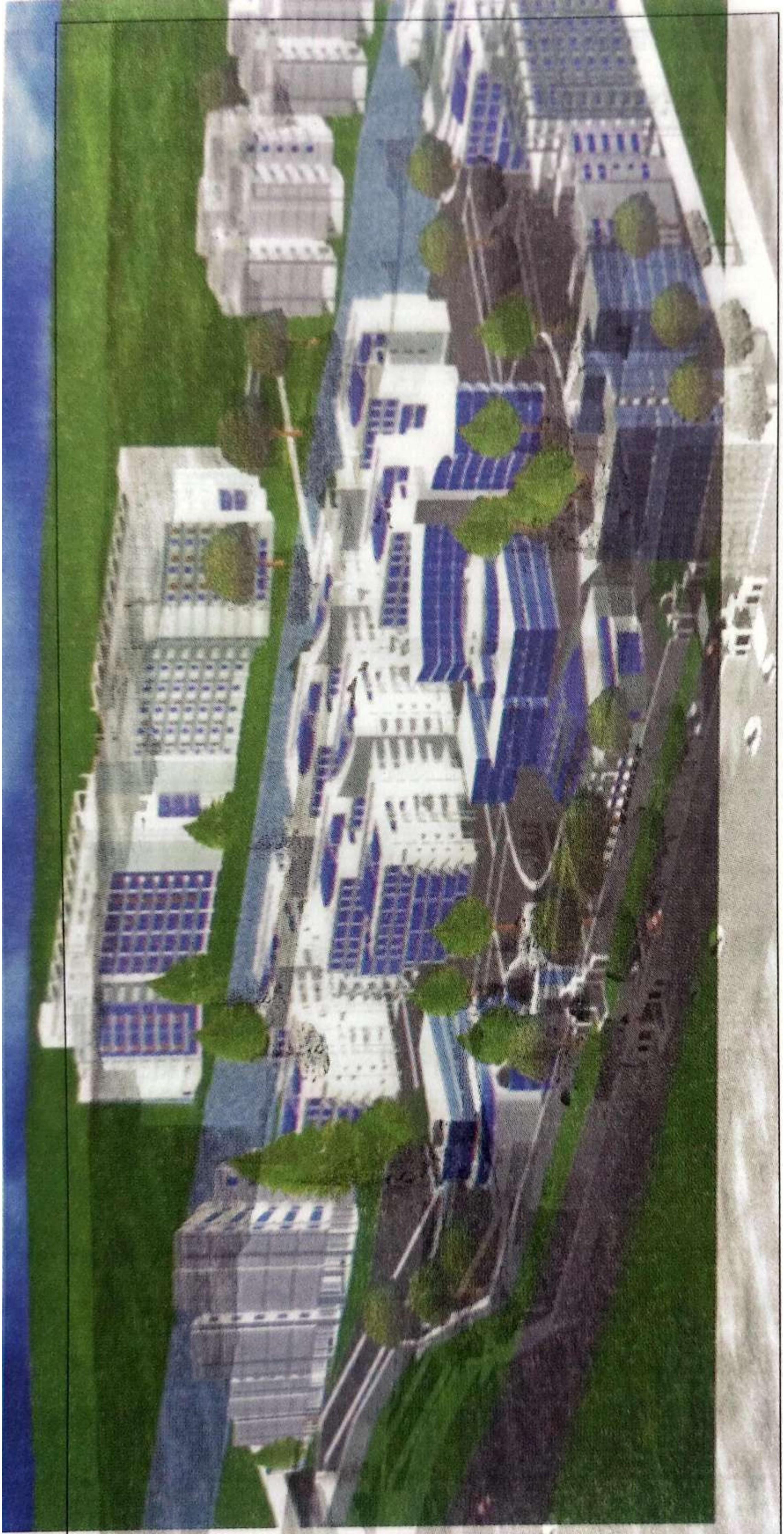

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০০১ উপলক্ষে বিশ্বকে তামাকমুক্ত করতে বাংলাদেশের জনসাধারণের পক্ষে আধুনিক এবং ক্যাট-এর যৌথ প্রস্তাবনা

১। আসন্ন জাতীয় সংসদের বাজেটে তামাকের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করা হোক।

২। বাংলাদেশ সচিবালয়কে ধূমপানমুক্ত করার ঘোষণা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হোক।

৩। টেলিভিশনের বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেলে তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হোক।

৪। প্রতিটি সিনেমা হলে ছবি প্রদর্শনের আগে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট ধূমপানের বিপক্ষে সচিত্র বিজ্ঞাপন অথবা সতর্কীকরণ বক্তব্য প্রচার করা হোক।

৫। সব ধরনের জাতীয় মেলা অথবা প্রদর্শনীকে ধূমপানমুক্ত করা হোক।

৬। তামাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিএটিকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে জনবহুল এলাকা ঢাকা থেকে কোন নির্জন স্থানে সরিয়ে নেয়া হোক।

৭। সংবাদপত্র, খেলার মাঠ, গানের অনুষ্ঠান এবং রাস্তার পাশে তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হোক।

৮। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে তামাকের কুফল সম্পর্কে নিবন্ধ সংযোজন করা হোক।

চরিত্রহীনতা যৌন ব্যধির মূল কারণ। চরিত্রবান লোকের সিফিলিস, গণোরিয়া, এইড্স্ ইত্যাদি হয় না। এইড্স্ নিরাময়ের কোন ওষুধ নাই। এ রোগ দেখা দিলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রতিরোধই একমাত্র হাতিয়ার।

লেখকের অন্যান্য বই

- *A Simplified Tuberculosis Control Programme for East Pakistan.* 1962
- *Tropical Eosinophilia.* 1964
- *Symposium On Medicine.* 1969
- *Essentials of Medical Treatment* 1974
- *স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু কথা* 1978
- *History of IPGMR* 1978
- *Prescription And Professionals.* 1985
- *প্রেসক্রিপশন (পশ্চিম বঙ্গ সংস্করণ)* 1986
- *তামাক ও ধূমপান : অভিমত-প্রশ্ন-উত্তর* 1995
- *Tobacco Smoking : Opinions—Questions I Answer.*
- *জীবন স্রোতে* 1987
- *সবাক বিবেক : The Voice of Conscience.* 1991
- *প্রেসক্রিপশন (তৃতীয় সংস্করণ)* 1994
- *কিছু ভাবনা* 1996
- *Some Thoughts* 1996
- *বঙ্গবন্ধু : ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দৃষ্টিতে* 1997
- *Medical Diagnosis and Treatment (Fourth Edition)* 1998
- *IAHS TO USTC : A PICTORIAL PRESENTATION* 1998

জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম এ দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা-বিদ্যাপীঠ আই.পি.জি.এম.আর.এর রূপকার-'ফাউন্ডিং ফাদার' হিসেবেই কেবল নন, অসামান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও তৃতীয় বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাতীয় ওষুধ নীতির অন্যতম স্রষ্টা হিসেবেও বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী। কর্তব্যানুরাগ তাঁকে শুধু মহান মানুষে পরিণত করেনি, গত পাঁচ দশকের সাধনা ও ত্যাগ তাঁকে গড়ে তুলেছে এক প্রতিষ্ঠানে। তাঁর চিকিৎসা, সংস্পর্শ, জনভাষণ, গবেষণা ও প্রশাসন এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণের বাইরে দূর গাঁয়ে জনজীবনে তাঁর মিশে যাবার দিকগুলো লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন তিনি। মওলানা ভাসানীর অন্তিম দিনগুলো কেটেছে তাঁরই কাছে। ১৯৮৯ সনে বঙ্গভবনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করার কথা প্রেসিডেন্ট এরশাদ উচ্চারণ করেছেন এ ব্যক্তিত্বকে কাছে রেখে। জন্ম তাঁর ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল, চট্টগ্রামে। মা বেগম গুলমেহের তাঁর জীবনে অপরিমেয় প্রভাব রেখেছেন। বাবার নাম সৈয়দুর রহমান। তাঁর দু'মেয়ের নাম দীনা ও নীনা ইসলাম, এক পুত্র আহমেদ ইফতেখারুল ইসলাম। আনোয়ারা ইসলাম তাঁর সহধর্মিণী। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ১৯৫১-র এম.বি.বি.এস. প্রফেসর ইসলাম বিলাতের ওয়েল্স ভার্সিটির টি.ডি.ডিতে প্রথম স্থান অধিকার করার পাঁচ মাসের ব্যবধানে প্রথম পরীক্ষাতেই এম.আর.সি.পি. (এডিন) হয়েছিলেন '৫৬ সনে। ঢাকা, মিটফোর্ড এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার পর '৬৩ সালে আবার তিনি যান বিলাতে, এবার নাফিল্ড ফেলোশীপে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে। এখানে যকৃৎ রোগের উপর তাঁর ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়। ব্রিটিশ সাময়িকী তাঁকে অভিহিত করেছেন আই.পি.পি.এম.আর.-এর ফাউন্ডিং ফাদার বলে। '৬৫ থেকে '৮৭-র ৩১শে মার্চ জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাঁর হাতে। লন্ডন রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস '৬৭তে বিনা পরীক্ষায় এম.আর.সি.পি. ডিগ্রী দিয়েছে তাঁকে। এ অঞ্চলে এ বিরল সম্মান এটাই ছিল প্রথম। আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শতেক গবেষণা নিবন্ধ। একাডেমী অব সায়েন্সের স্বর্ণপদক বিজয়ী এ চিকিৎসা বিজ্ঞানী '৬৩র প্রেসিডেন্ট পদক, '৮৫র কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্বর্ণপদক, '৭০-এর সিতারা-ই-ইমতিয়াজ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৯০ এবং ১৯৯২-এর স্মারক স্বর্ণপদক, দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে ভারতের গোল্ডেন গ্রাহক সেবা পদক এবং পাকিস্তানের মদিনাতুল হিকমতের ওসিকা-এ-আতরাফ ও মহাত্মা এম.কে. গান্ধী অহিংস শান্তি পুরস্কার, নরওয়েসহ বহু পদক অর্জন করেছেন। ২০০০ সালে তিনি সম্মানসূচক ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্বনন্দিত 'আধুনিক', আই.এ.এইচ.এস. এবং ইউ.এস.টি.সি.র (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের) তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ইসলামি মেকিল মিশন তাঁরই সৃষ্টি। মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, জাতীয় এইডস কমিটি, জনসংখ্যা কাউন্সিল, বার্ডেম ন্যাশনাল কাউন্সিল, একাডেমী অব সায়েন্সেস, জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ ও জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত। বাংলায় তাঁর পুস্তক 'পল্লী চিকিৎসায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ', গ্রন্থ 'প্রেসক্রিপশন', 'কিছু ভাবনা' ও ইংরেজীতে 'মেডিকেল ডায়াগনসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট', 'সাম থট্স' আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। সুলেখক, অমায়িক ও জনসেবক এ চিকিৎসক রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিকসহ অজস্র পেশার মানুষের কাছে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। জাতীয় অধ্যাপক ইসলাম আজও এ দেশের সর্বস্তরের আর্ত মানুষের কাছে নিজেকে হাজির করছেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অক্লান্ত সমাজসেবী-রূপে।

ISBN - 984-31-02746